শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

চরিত-কথা

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ.

প্রণীত

প্রকাশক :—

শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,

'বিশুদ্ধাশ্রম'—বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

প্রথম ভাগ

চরিত-কথা

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ.,

প্রণীত

প্রকাশক :—

শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,

'বিশুদ্ধাশ্রম'—বর্দ্ধমান।

* [মূল্য ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। প্রকাশক—

শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান।

২। কার্য্যকারক—

বিশুদ্ধানন্দ-কানন আশ্রম, মালদহিয়া,
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

প্রথম মুদ্রণ—১৩৩৪

পুনর্মুদ্রণ—১৩৬৫

কমলা প্রেস, গোধুলিয়া, বারাণসী হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রী ১০৮ যুক্তেশ্বর

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব

গুরুদেবের শ্রীচরণ-কমলে

হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়

সাদরে সমর্পিত হইল।

"ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।"

শ্রীচরণাশ্রিত

দীন গ্রন্থকার

Pandit Mahimanand Bhattachari
Eskalay(?)
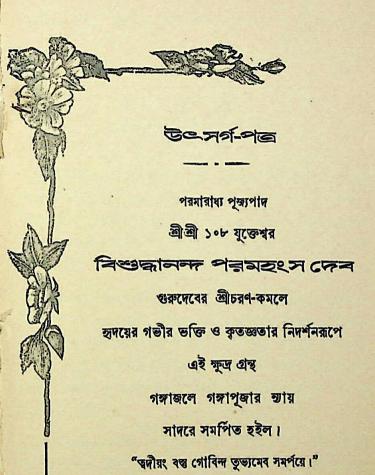
প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীভগবানের কৃপায় পরমারাধ্যপাদ পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য-প্রসঙ্গের প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—প্রকাশিত হইল। ইহা ঠিক জীবন-চরিত্র নহে, তাহার আভাস মাত্র। নানা কারণে মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত্র রচিত হইতে পারে না। সেই জন্য গ্রন্থকার সে চেষ্টা করেন নাই।

গুরুভ্রাতা ও গুরুদেবের ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে এই পুণ্যপ্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ 'চরিত-কথা' নামে সেই বৃহৎ প্রসঙ্গ-মালার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা মাত্র। ইহার পরবর্ত্তী ভাগসমূহে যোগতত্ত্ব, সূর্য্য-বিজ্ঞান-তত্ত্ব, শিষ্যদিগের জীবনে সদ্‌গুরুর আত্মপ্রকাশ, তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা থাকিবে।

এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত হয় নাই—যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবক অথবা ভক্ত, তাঁহাদিগের আত্মবিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিলেই গ্রন্থনির্ম্মাণ সফল বিবেচিত হইবে। আশা করি, গ্রন্থকার ও গ্রন্থের যাবতীয় দোষ উপেক্ষা করিয়া ভক্ত পাঠকগণ আলোচ্য চরিত্রের পবিত্র আদর্শে আপন আপন লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবেন। তবে যদি সাধারণ পাঠকের মধ্যে সহৃদয় ও সমভাবাপন্ন কোন মহাশয় ব্যক্তি আপন গুণে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পাঠ করিয়া লেশ মাত্রও তৃপ্তি লাভ

করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের চিত্তগত মহত্ত্ব এবং আলোচ্য চরিত্রের স্বাভাবিক গৌরবই তাহার কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিবেদন ইতি—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন"
মালদহিয়া, ৺কাশীধাম।

নিবেদক—
শ্রীদুর্গাকান্ত রায়,
পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ।

ভূমিকা।

আজকাল পাশ্চাত্যদেশে জীবন-চরিত রচনার একটা প্রবল উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী, জ্ঞানী, গুণী, কলাবিৎ, কর্ম্মবীর,—এক কথায় যাঁহারা জীবনে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন—সকলেরই জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়া থাকে এবং এই প্রকার আলোচনা জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে উপযোগী—এমন কি, আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান যুগে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কালেও যে একেবারে ছিল না তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন সাধারণ মনুষ্যের মতন নহে। তাঁহাদের জীবন আদর্শস্বরূপ হইলেও সর্ব্বস্থানে জগতের অনুকরণযোগ্য হয় না। তাঁহাদের উপদেশ পালনীয় বটে, কিন্তু অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তাঁহাদের ন্যায় অবস্থা লাভ হইতে পারে না। তাঁহারা যে উপায়ে বড় হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে লোকের উপকার হইতে পারে, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা গুহ্য বিষয়—তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। সদ্‌গুরুর শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আদেশে কার্য্য করিতে পারিলে দীর্ঘকালের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ফলে জীবনের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশ্য শুদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, অস্বাভাবিক অনুকরণে কোন ফল হয় না।

আর ঐ প্রকার জীবনচরিত আখ্যায়িকার ন্যায় লিখিয়া বর্ণনা করিবার বিষয়ও নহে। যিনি সে প্রকার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারই ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র হইবে। Renan খৃষ্টের, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা যে সফলতা লাভ করে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাকে যথার্থ জীবনী বলে, তাহা কোন মহাপুরুষেরই হয় নাই। যে লিখিবে, সে যদি ঐ প্রকার উচ্চ অবস্থাপন্ন পুরুষ না হয়, তাহা হইলে সে আলোচ্য জীবন নিজেই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে না—ঐ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিচিত্র রহস্য জাগিয়া উঠে তাহা তাহার দৃষ্টিতে কখনও পতিত হইবে না—বোধগম্য হওয়া ত দূরের কথা। ইহার ফলে দিব্য চরিত্রে নিজের ভাবানুরূপ ক্ষুদ্রতা ও মানবীয়তা আরোপিত হয়, নিজের ভ্রান্তিপ্রবণ বিবেচনাশক্তির মানদণ্ডে আলোচ্য জীবনের অনুচিত বিচার করা হয়—এক কথায় সত্যের অবমাননা হয়। মহম্মদের জীবন-চরিত পড়িয়া ঠিক ঠিক মহম্মদকে চিনিতে পারা যায় না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—সকলের সম্বন্ধে ঐ একই কথা। বুদ্ধ-চরিত বা ললিত-বিস্তর, শঙ্করবিজয় বা শঙ্কর-বিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত বা চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কোনটিই যথার্থ জীবন-চরিত নহে।

জীবন-চরিত রচনা বড় কঠিন জিনিষ; কঠিন কেন, বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক জনের জীবন আর এক জনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লিখিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যে তাহার কতটুকু বুঝিবে! যে যতই জ্ঞানী হয় ততই তাহার নিজের জীবনও তাহার নিকট রহস্যময় মনে হইতে থাকে। যে বিরাট্ শক্তি জগতের অন্তরে বাহিরে, অণু ও মহতে খেলা করিতেছে, যাহার খেলা আমরা শুধু অহঙ্কার প্রযুক্ত মোহের আবরণ বশতঃ দেখিতে পাই না, তাহা যে প্রতি জীবনে খেলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। অহঙ্কার-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট্ শক্তির ক্রীড়া যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সে মহিমার আভাস দেখিতে পায়, মহাশক্তির খেলা দেখিয়া সে ধন্য হইয়া যায়।

কবি বলিয়াছেন—

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

তখন তাহার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জীবন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যে আচ্ছন্ন মনে হয়। তাহার কারণানুসন্ধিৎসা একটি অনন্তশক্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবনের চরমতত্ত্ব যেখানে রহস্যময়, সেখানে জীবন-চরিত রচনার ব্যর্থ প্রয়াস উপহাসাস্পদ। আর যদি সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তির খেলা দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত জীবনের প্রতি ভাব ও প্রতি ঘটনার মূলে নিজের অহঙ্কারকেই স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু তাহা যে একেবারেই ভুল, সে-কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের পরিচ্ছিন্ন শক্তির অন্তরালে থাকিয়া একটি অদৃষ্ট মহতী শক্তি কার্য্য করিতেছে। কখনও তাহার বলে ক্ষুদ্রশক্তি পুষ্ট হইয়া মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কখনও-বা তাহার প্রতিবন্ধকতায় ক্ষুদ্রশক্তি আপনার অনুরূপ ক্ষুদ্রকার্য্য সাধনেও সমর্থ হইতেছে না। সে শক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব চিন্তাশীল মনুষ্যমাত্রই চিরকাল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধেই যখন প্রকৃত জীবনী নির্ম্মাণ এত কঠিন, তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে ত তাহা অসম্ভবই বলিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত অহঙ্কার দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে ততদিন পর্য্যন্ত জীবন-চরিত রচনার চেষ্টা হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহার পরে আর হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত নাই। যাহা আছে, তাহা

কতকগুলি প্রাণহীন স্থূল ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। তাহা বৃত্তান্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবন নহে।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

ভবভূতির এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লোকোত্তর পুরুষের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল। উহাতে একই সময়ে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ যেমন যাবতীয় বিরোধের একাধার, অথচ তিনি গুণাতীত ও নির্লিপ্ত, তাঁহার ভক্তগণও সেই প্রকার। কে তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনায় সাহসী হইবে?

আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্যময় স্মৃতি আলোচনা করিবার জন্য আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি একজন আদর্শ-চরিত্র যুক্তযোগী। এই প্রকার শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন, জগতে অতি-বিরল। তাঁহার পুণ্যজীবন পর্য্যালোচনা করিয়া নিজে ধন্য হইব, এই আশাতেই আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। যাঁহার লোকাতীত জীবনের এক কণা বুঝিতে পারিলে মনে হয় এ জীবন সফল হইল, যাঁহার অসংখ্য বিভূতির দুই একটি সামান্য স্ফুরণমাত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, যাঁহার স্থূল দেহ পর্য্যন্ত আমাদের সূক্ষ্মতম বিচারের অনায়ত্ত, তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিবার প্রবৃত্তি আমার হইতে পারে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার জীবন-চরিত্র নহে—তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী ও তাঁহার উপদেশ মাত্র। ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই, এমন কি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য-সূত্রও সর্ব্বত্র না থাকিতে পারে। আর তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টাও কখনও করা হয় নাই। আশ্রিত ভক্তগণের জীবনে আশ্রয়দাতার কৃপা নানা সময়ে নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে

—তাহারই দুই-চারিটি নিদর্শন কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভক্তের জীবনে ভগবানের লীলা কত প্রকারে হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? আর তাহার সংখ্যা বা ইয়ত্তা করাই বা কাহার সাধ্য? ভগবান্ নিরপেক্ষ, অহেতুক করুণাশালী,—কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তের আকুল হৃদয় তাঁহার করুণা বিস্মৃত হইতে পারে না। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই প্রকার স্মৃতি-চর্চ্চা ব্যতীত অপর কিছু নহে। যাঁহার স্মৃতি, তাঁহার পরিচয়ের জন্য তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা বর্ণনা আবশ্যক। প্রথমে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে (প্রথম ভাগ)। তদনন্তর তাঁহার লীলা-প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী সংযোজিত হইয়াছে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ)। ইহার অধিক অগ্রসর হইবার অধিকার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নাই।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন একজন মহাপুরুষ আজ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, যিনি জীবনে অতি-কঠোর সাধনাপূর্ব্বক ও অলৌকিক দৈবানুগ্রহে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের তত্ত্ব সকল অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া তত্ত্বাতীত পরম পদে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, যিনি যোগ ও বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়া শাস্ত্রের রহস্যসকল নিজের অচিন্ত্য বিভূতি-বলে যোগ্য অধিকারীকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, যিনি আদর্শ যোগী, আদর্শ জ্ঞানী ও আদর্শ ভক্ত, যিনি মন্ত্রার্থবিৎ সত্যসংকল্প মহাত্মা, যিনি পরমতত্ত্বের প্রদর্শক, ভগবানের অনুগ্রহশক্তির সঞ্চারিণী মূর্ত্তিস্বরূপ, যিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধ স্ফুরণাত্মক মহাত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে সামঞ্জস্যময় অবস্থার অধিষ্ঠাতা, যাঁহার নিকটে দেশ ও কালের সত্তা অলীক ও কল্পিত—এক কথায় যিনি প্রকৃত সদ্গুরু শ্রীভগবানেরই প্রকটরূপ। তাঁহারই কৃপায় আজ যেন আমরা তাঁহাকে বুঝিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি। যিনি প্রাকৃতিক বিকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সংস্পৃষ্ট নহেন—অখণ্ড চৈতন্যের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আজ যিনি বিশ্বজগতের হৃদয়-কমলে বিশ্বনাথের ন্যায় অন্তরাত্ম-রূপে

বিরাজ করিতেছেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠুন, তাঁহার শ্রীচরণে ইহাই একমাত্র সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

কাল-প্রভাবে সদ্ধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য ঋষি-জনোচিত দিব্যভাব হইতে চ্যুত হইয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছে, অসারকে সার বিবেচনা করিয়া তাহারই অন্বেষণে অমূল্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছে। শাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়াছে—সে তপস্যা নাই, সে সরলতা নাই, সত্যের সহিত পরিচয় না থাকাতে সে শ্রদ্ধা ও সত্যানুরাগও নাই। তাহার দেহ অশুদ্ধ, মন অপবিত্র, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন। সে কি কখনও ধর্ম্মের যথার্থ রূপ দেখিতে পারে? দেখিতে পারে না বলিয়াই তাহার সংশয় কাটে না, বিচারের মোহ ছোটে না, সত্যের উদার ও মাধুর্য্যময় রূপের আকর্ষণ অনুভবে আসে না। সেইজন্যই তাহার বিক্ষিপ্তচিত্তের চাঞ্চল্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না। যে সুধার আস্বাদনের জন্য অমরধামের অধীশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত নিরন্তর সতৃষ্ণভাবে নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার ক্ষীণ আভাস পাইলেও মুগ্ধ জীব ক্ষণিকের জন্য নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে; যাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, তাহার অশান্তিরও বিরাম হয় না, বাসনা-বদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবকে সেই অমৃতধারা পান করাইবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষগণ কল্যাণময়ী জগন্মাতার প্রেরণাতে মর্ত্ত্যভূমিতে সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

সে আনন্দরস-পানে চির-প্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে।

সদ্‌গুরু ভিন্ন সে আনন্দের সন্ধান চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে আর কেহই জানে না। আজ তিনি আমাদিগকে সেই পরমানন্দের সন্ধান দিয়া বিষয়ের ও কামাদি রিপুনিচয়ের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করুন।

আমি জানি, এ স্মৃতি-চর্চ্চা করিবার অধিকার আমার নাই। শুচি ও সংযত না হইয়া যেমন দেবগৃহে প্রবেশ ও দেবার্চ্চনা করিতে পারা যায় না, সেই প্রকার মলিন ও চঞ্চল অন্তঃকরণের পক্ষে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের স্মরণও নিষিদ্ধ। ইহা জানিয়াও, নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও—আমি যে বর্ত্তমান প্রসঙ্গালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ আছে।

প্রথমতঃ, এই চর্চ্চায় ফলে যদি বিন্দুমাত্রও স্বর্গীয় পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও বিবেকের আভাস এই মলিন হৃদয়ে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইয়া যাইব। অগ্নি যেমন নিজের সঙ্গ প্রভাবে অশুদ্ধ বস্তুকেও উপেক্ষা বা অনাদর না করিয়া আত্মসাৎ করিয়া পবিত্র করিয়া লয়, তেমনই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ সঙ্গ কলুষিত চিত্তকেও অনুকূলভাবে অবশ্যই প্রভাবিত করিবে—এই আমার ভরসা। শ্রীভগবানের করুণার উপরে দীন ও পতিত জনেরও দাবী আছে। অশুদ্ধদেহ শিশু যেমন পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার না করিয়া গর্ভধারিণীর অঙ্কে উঠিবার জন্য ব্যাকুলভাবে কর প্রসারণ করে, জননীও তেমনই ঐ প্রকার শিশুকে অঙ্কে উঠাইতে কখনই দ্বিধা বোধ করেন না। মাতৃ-অঙ্কের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা যে, উহার পূতস্পর্শে শিশুর মল-ক্ষালন আপনা-আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, আমি যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই সুমহৎ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। যিনি প্রকৃত সত্যপিপাসু, জ্ঞানলিপ্সু, তিনি নিশ্চয়ই সত্যনিরূপণের জন্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। যদি তাঁহাকে জাগাইবার পক্ষে আমার এই কর্কশ রবও কার্য্যসাধক হয়, তাহা হইলে ইহা সার্থক। নানাকারণে আমি অযোগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া যোগ্যতর ব্যক্তিকে ডাকিবার অধিকারও যে আমার নাই, তাহা নহে। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মহার্ঘ্য রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে, যিনি

অন্বেষক ও পরীক্ষক, তিনি আসিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করুন। হয়ত ভাগ্যে থাকিলে তিনি অতুল সম্পদের অধিকারলাভ করিতে পারিবেন। আমি শুধু একপ্রান্ত হইতে ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

"বিশুদ্ধানন্দ-কানন"
৺কাশীধাম।
৺শিবরাত্রি, ১৩৩৪।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

মঙ্গলাচরণম্ ।

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দস্তোত্রম্ ।

নীলাম্ভোরুহপঙ্‌ক্তিসোদরবপুর্লক্ষ্মীঃ প্রসাদোত্তর-
স্নেহাঽভ্যক্তবিশাললোচনরুচা কর্ষন্ সতাং মানসম্ ।
আনাভিপ্রসরচ্ছরৎসমুদয়ৎকাশাভকূর্চ্চোজ্জ্বলো
দেবঃ শঙ্কর এব সদ্‌গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোঽবতু ॥ ১ ॥

যস্মিন্নভ্যুদিতে হৃদন্তরমহাকাশে প্রকাশাঽধিকে
তামিস্রাণি চ বাসনাত্মকবপুঃশালীনি যান্তি ক্ষয়ম্ ।
আনন্দং মকরন্দমন্তরধিকং বিভ্রন্মনঃপঙ্কজং
নিদ্রাং মুঞ্চতি তং ভজে গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং প্রভুম্ ॥ ২ ॥

যস্মিন্ জাগ্রতি যোগিবৃন্দপরমাচার্য্যে প্রভাবোত্তরে
সূর্য্যস্যেব তু রশ্মিভিস্ত্রিজগদারম্ভপ্রতিষ্ঠোত্থতে ।
প্রাচীনৈঃ করণৈঃ পুরেব বিদধৎ সৃষ্টিং বিধাতা ন কিং
লজ্জামঞ্চতি, হন্ত তং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে ॥ ৩ ॥

শিষ্যা যস্য পদাম্বুজোদ্ভবসুধামাপীয় পীনশ্রিয়ো
বাগীশেন সমং সভাসু বিজয়স্পর্দ্ধাং বহন্ত্যুচ্চকৈঃ ।
লক্ষ্মীঃ পদ্মসরো বিহায় সততং দাসীব যং সেবতে
তং বন্দে যমিনাং বরং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং প্রভুম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরঃ প্রিয়তমামাশ্রিত্য শক্তিং নিজাং
স্বেচ্ছামাত্রপরিগ্রহো বিতনুতে যদ্বিশ্বমত্যদ্ভুতম্ ।

যস্তন্মর্ম্মরহস্যবিত্তদভিদাপন্নো বিপন্নাশ্রয়-
স্তং ভক্তৌঘসুরদ্রুমং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞানানি বহূনি সন্তি বিবিধা বৈজ্ঞানিকেন্দ্রা অপি
প্রায়স্তে বহিরের বুদ্ধিমধমাং ব্যাপারয়ন্তেতমাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যকরং ত্রিকালসফলং তৎসৌরবিজ্ঞানকং
যস্মাদাবিরভূৎ স রক্ষতু বিশুদ্ধানন্দযোগীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

বন্দে নন্দিতভক্তবৃন্দমুদয়দ্বাৎসল্যবারানিধিং
বালার্কপ্রতিমল্লদিব্যমহসাং সজ্বাতমুচ্চৈস্তমম্।
অজ্ঞানান্ধকঘোরগর্ত্তপতিতোদ্ধারাধ্বরে দীক্ষিতং
বিশ্বেশং মনুজাকৃতিং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং পরম্ ॥ ৭ ॥

বন্দে কিঞ্চিদচিন্ত্যশক্তি ভবভীতাত্যৈকশান্তিপ্রদং
কারুণ্যামৃতসিন্ধু সিন্ধুতনয়াবাগ্দেবতারাধিতম্।
আকারেণ নরং বিনাশিতদরং যৎকর্ম্মণা শঙ্করং
বিখ্যাতং ভুবনেষু তং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং মহঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিন্! সদ্গুরুনাথ! নাথিতবতাং সর্ব্বস্বদানোৎসুকঃ
কোঽন্যোঽস্মিন্নবনীতলে সুবিপুলে জাগর্ত্তি সামর্থ্যবান্।
মন্যে বীক্ষ্য বদান্যতামনুপমাং শ্রীমৎপদাজ্জোদিতাং
কাষ্ঠীভূয় পলায়িতঃ সুরতরুর্লীনো বনে নন্দনে ॥ ৯ ॥

দৈবং মানুষপাশবাদিসকলং সর্গং বিধাতুং ক্ষমঃ
খেচর্য্যাদিসমস্তসিদ্ধিনিবহৈরঙ্কাশ্রয়ৈরঞ্চিতঃ।
মূর্দ্ধান্তঃস্থিতশঙ্করঃ সুরভিতাসজ্ঞাতরত্নাকরঃ
পায়ান্নঃ প্রতিভাকরো গুরুবিশুদ্ধানন্দযোগীশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

আবাল্যাদতিমানুষৈরবিতথৈঃ পুণ্যাবদানৈর্নিজৈ-
রাশ্চর্য্যং কুতুকং ভয়ং চ জনতাচেতঃসু বিস্তারয়ন্।
স্বাধীনঃ স্ববশীকৃতাখিলমহাভূতঃ প্রভূতদ্যুতি-
র্যোগীন্দ্রো দয়তাং দয়াময়বিশুদ্ধানন্দনাথো ময়ি ॥ ১১ ॥

সর্ব্বাঙ্গাঞ্চিতরোমকূপবিসরৎসৌরভ্যসম্ভাবিত-
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গকদম্বডম্বরভবৎসঙ্গীতসারস্তুতঃ।
শ্রীমাতুঃ স্তনজং ধয়ন্নবিরতং বৃদ্ধোঽপি বালোপমঃ
ক্রীড়াকৌতুকিসদ্গুরুর্বিজয়তে যস্তং বয়ং মন্মহে ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দাষ্টকম্ ঃ

প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুকোটিকূটস্ফুরত্ত্বিষে।
বিশুদ্ধানন্দনাথায় গুরবে সততং নমঃ ॥ ১ ॥

সূর্য্যবিজ্ঞানসম্ভারবিহিতাদ্ভুতকর্ম্মণে।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ বিশুদ্ধানন্দবেধসে ॥ ২ ॥

যৎকৃপাতরিমাসাদ্য তীর্ণোঽহনেকৈর্ভবার্ণবঃ।
বন্দে পরমহংসং তং বিশুদ্ধানন্দনাবিকম্ ॥ ৩ ॥

ভৃগুরামকৃপাপাত্রং ছত্রং শিষ্যজনস্য যৎ।
বিশুদ্ধানন্দবিজ্ঞানসত্রমেকং শ্রিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪ ॥

রাজরাজেশ্বরীপীনস্তনন্ধয়মপি স্ফুটম্।
বর্ষীয়াংসমহং বন্দে বিশুদ্ধানন্দসদ্গুরুম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাঙ্গসৌরভোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতসংস্তুতম্।
বিশুদ্ধানন্দকমলমমলং বিতনোতু মাম্ ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদ্দামস্ফুরদ্ধামনয়নাম্ভোজমঞ্জুলম্।
বর্ষন্তমিব কারুণ্যং বিশুদ্ধানন্দমাশ্রয়ে ॥ ৭ ॥

যোগপ্রভাবসম্পন্নসিদ্ধিবৃন্দসমেধিতম্।
নরাকারং শিবং বন্দে বিশুদ্ধানন্দনামকম্ ॥ ৮ ॥

Pandit Gopinath Kaviraj Brahmachari Exchange

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

চরিত-কথা

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী বণ্ডুল গ্রামে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার দীর্ঘকাল হইতে স্বধর্ম্মপালন, অতিথিসেবা ও দেবদ্বিজে ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। কিঞ্চিদধিক ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শুভ ফাল্গুন মাসের উনত্রিংশৎ দিবসে নববসন্তের সমাগমে এই পরিবারের একটি অতি-মহৎ গৌরবের সময় সমাগত হইয়াছিল। তখন চারিদিকে প্রকৃতির লাবণ্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছিল। চারিদিকে শস্যশ্যামল প্রান্তরের স্নিগ্ধতা, বনভূমির শ্যামলতা, আকাশের নীলিমা, নবোদ্‌গত পত্রের শোভা, নববিকশিত কুসুমরাজির সৌরভ বণ্ডুল গ্রামটিকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং অদূর ভবিষ্যতের গৌরব-মহিমার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস সঞ্চার করিয়াছিল। একদিন প্রকৃতির গুপ্ত-কক্ষ ভেদ করিয়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যমালা যিনি প্রকৃতিরই কৃপায় অসাধারণ রূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রকৃতির পূর্ণ উন্মেষের সময়েই ত সেই প্রকৃতির শিশুর আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে চট্টোপাধ্যায় অখিলচন্দ্র এবং তৎসহধর্ম্মিণী দেবী

রাজরাজেশ্বরী ভগবতী জগন্মাতার শুভাশীর্ব্বাদস্বরূপ একটি অপূর্ব্ব পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

ধন্য বণ্ডুলগ্রাম, ততোধিক ধন্য চট্টোপাধ্যায়-বংশ, আরও ধন্য অখিলচন্দ্র ও দেবী রাজরাজেশ্বরী। যে-বংশে একজন তত্ত্বজ্ঞানী ও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, সে-বংশের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সদ্‌গতি লাভ করে।

নবজাত শিশুকে দেখিয়া পিতামাতা, পরিবারস্থ সকলে এবং প্রতিবেশিগণ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। উত্তরকালে যাঁহার লোকোত্তর সামর্থ্যে জগৎ চমকিত হইয়াছে, তিনি যে জন্মমাত্রই আপন অলৌকিক রূপে সকলের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সকলেই অনুভব করিয়াছিল, এরূপ অসামান্য তেজঃপুঞ্জময় দেহ অতি-অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শিশুর চক্ষু দুটি অতীত সংস্কারের মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া যেন কোন্ সুদূর চিরশান্তিময় রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্থির হইয়া থাকিত। যেন বুঝিতে পারিত, এ জগৎ বড় দুঃখের স্থান, বড় বেদনার জায়গা, তাই এ জগতের দৃশ্যমাত্রের প্রতি নিমেষের জন্য করুণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই সদানন্দময় অন্তর্জগতের দিকে তাকাইয়া থাকিত। যে দেখিত, সে-ই মনে করিত, এ শিশু আলোকসামান্য,—বৈষ্ণবী মায়া ইহার স্বচ্ছ অন্তঃকরণকে এখনও তেমনভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহাপুরুষের লক্ষণ শিশুদেহে লক্ষিত হইত;—যাঁহারা লক্ষণজ্ঞ তাঁহারা দৈহিক অনুভাবাদি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন

যে, এ শিশু একদিন 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইবে—অধ্যাত্মরাজ্যের সম্রাট্-পদে অধিরোহণ করিবে।

ধীরে ধীরে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতামাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন—"ভোলানাথ"। নামটি যে সার্থক হইয়াছিল শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনই তাহার প্রমাণ।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'Child is the father of man.' অর্থাৎ মনুষ্য ভবিষ্যৎ-জীবনে যে অবস্থা লাভ করে, পূর্ব্বজীবনেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। বালক ভোলানাথেরও বাল্য হইতেই অসাধারণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যিনিই তাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার অবকাশ পাইতেন, তিনিই তাহার অসামান্যভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতেন। তাহার জননী, কাকা, খুড়ীমা, খেলার সাথী—সকলেই ভোলানাথকে প্রাণাধিক ভালবাসিত। বালকের চরিত্র-বল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নির্ভীক প্রকৃতি তাহাকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল।

বাল্যকালে ভোলানাথ ঠাকুর দেবতা লইয়া খেলাধূলা করিতে ভালবাসিত। বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্যামসুন্দর, সিদ্ধেশ্বরী, জয়দুর্গা, মনসা, গজলক্ষ্মী, তাল-বেতাল, লক্ষ্মী-নারায়ণ, নাড়ুয়াগোপাল প্রভৃতি নানা দেব-বিগ্রহ চণ্ডীমণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজমান ছিলেন। বালক খেলাচ্ছলে উহাদিগের পূজা করিত—বন হইতে বন্যকুসুম চয়ন করিয়া আনিত, নিজহস্তে সুশোভন মাল্য গ্রথিত করিত, চন্দন ঘর্ষণ করিয়া পূজাসম্ভারের

আয়োজন করিত, তুলসী, বিল্বপত্র তুলিয়া আনিত—এই সকল অবলম্বনে প্রাণের সহিত পূজা করিয়া বালক ক্ষুদ্র হৃদয়ে তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদন করিত।

বালক কখনই দেবপূজা না করিয়া স্বয়ং জলগ্রহণ করিত না। ভবিষ্যতে অধ্যাত্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বরাজি আবিষ্কার করিয়া যিনি জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বাল্যাবস্থায় দৈব-শক্তির সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালকের পূজা অমন্ত্রক, বিধি-রহিত, নিয়মের অতীত—তথাপি উহা যে হৃদয়ের গভীরতর অন্তস্তল হইতে প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসরূপে উত্থিত হইত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" প্রাণের ভাব অথবা ভক্তি পূজার সূক্ষ্মতত্ত্ব। ভাবরহিত পূজা পূজাই নয়—মন্ত্রাদি আয়োজন শুধু হৃদয়স্থ সুপ্তভাবরাশিকে প্রকাশিত করিবার জন্য—উহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বালকের হৃদয়ে জন্মান্তরের শুভসংস্কারনিবন্ধন, প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে, সৌভাগ্যক্রমে শৈশব হইতেই দিব্যভাবের বিকাশ হইয়াছিল; সুতরাং তাহার পূজা বালসুলভ ক্রীড়াস্বরূপ হইলেও যে প্রকৃত পূজার আদর্শ ছিল, তাহা নিশ্চিত।

শুনিতে পাওয়া যায়, বালক একদিন সঙ্গিবর্গের সহিত খেলাপ্রসঙ্গে গ্রাম হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে বালিদ্বারা শিব গড়িয়া বিল্বপত্রের দ্বারা তাহা পূজা করিতেছিল; এমন সময়ে একটি দুষ্ট বালক তাহাতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলতঃ, পূজা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ভোলানাথ তন্ময়চিত্তে পূজায়

নিমগ্ন ছিল। হঠাৎ এই প্রকার পূজার প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করিয়া রোষপূর্ব্বক সঙ্গী বালকটিকে বালোচিত চপলতার সহিত বলে,—'তুই যখন আমার শিবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস্ তখন নিশ্চয়ই আমার শিবের সাপ যাইয়া তোকে কাটিবে।' অবশ্য ইহা অভিশাপ নহে, বালচাঞ্চল্যের ফলমাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, পরিহাসচ্ছলে অথবা বালসুলভ ক্রোধবশতঃ যে-কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইল; যথার্থ ই সেইদিন বালককে সর্পে দংশন করিল, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোলানাথের করস্পর্শেই সেই বালক আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

বঙুল গ্রামের উত্তরে ভাণ্ডারডিহির নিকটস্থ শ্মশানক্ষেত্রে বটবৃক্ষতলে বসিয়া নির্জ্জনবাসের সুখ আস্বাদন করিতে বালক ভোলানাথ বড়ই ভালবাসিত। সেই স্থানটি তাহার বড় প্রিয় ছিল। যখনই অবকাশ পাইত, তখনই বালক সেই ঘোর জনহীন স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিতে পাওয়া যায়, শুদ্ধোদন-তনয় গৌতম বাল্যকালে এইরূপ নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ধ্যানস্থ হইয়া তন্ময়াবস্থায় থাকিতে ভালবাসিতেন। যিনি এক সময়ে জরা-মৃত্যুর আক্রমণ হইতে দুঃখসঙ্কুল জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যিনি ধ্যানিগণের অগ্রগণ্য হইয়া বোধিলাভ পূর্ব্বক জগৎকে অষ্টাঙ্গ বোধিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে বাল্যে এইরূপ নির্জ্জনতা-প্রীতি ও চিন্তাশীলতা অবশ্যই স্বাভাবিক। অন্যান্য মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বালক

ভোলানাথ যে এক সময়ে বিশিষ্ট ও উন্নত অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভ করিবে তাহা গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ অনেকেই এই বিশিষ্ট-প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সাধু-সন্ত আসিয়াছেন শুনিলে বালক তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য পাগল হইয়া পড়িত। তখন তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বাড়ীতে রাখা যাইতে পারিত না। বালক, যে কোন প্রকারেই হউক সুযোগ অন্বেষণ করিয়া দিবসে না হইলেও রাত্রিবেলা সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের দর্শন-লালসার তৃপ্তি-সাধন করিত। বয়স অল্প হইলেও বালক সাধুর সঙ্গে সদালাপ করিতে এবং অবস্থাবিশেষে নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক-বিতর্ক করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একবার বণ্ডুল হইতে কিছুদূরে কোন স্থানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া বালক সেখানে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ দিবসে যাইতে না পারিয়া রাত্রিবেলা যাইবার জন্য উদ্যত হইল। বালক সেই ঘোর নিশা সময়ে দুই একজন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে আপন আপন গৃহত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা নির্ভীক বালক একাকীই সেই নিশীথ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সুপ্ত প্রান্তর ও বনরাজি ভেদ করিয়া সাধুর আবাস-স্থানে উপস্থিত হইল। সাধুটি তাহার এই প্রকার অসমসাহস ও তেজস্বিতা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বালক, কি অদ্ভুতশক্তি তোমাতে প্রত্যক্ষ করিলাম, যে শক্তির প্রভাবে তুমি অল্পবয়স্ক হইলেও এই ঘোর

নিশীথে গাঢ় অন্ধকারে বিজন অরণ্য মধ্যে ভয়ঙ্কর শ্মশান ও দিগন্তব্যাপ্ত প্রান্তর একাকী অতিবাহিত করিয়া আমার নিকটে পৌঁছিয়াছ। তুমি এখন আত্মবিস্মৃত—নিজেকে নিজে চিন না। তুমি কালে কি হইবে তাহা পরে বুঝিতে পারিবে।”

একবার কোন কারণ বশতঃ ভোলানাথকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল। বালকের বস্তুতঃ কোন দোষ ছিল না, সেইজন্য ভর্ৎসিত হইয়া তাহার চিত্তে দারুণ অভিমানের উদয় হইল। ইহা তেজস্বি-প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বালক মানুষের উপর কখনই অভিমান করিত না। সে বিশ্বাস করিত যে, মানুষের কিছুতেই কোন কর্ত্তৃত্ব নাই—মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তাই তাহার অভিমান স্বভাবতঃ দেবদেবীর উপরেই ন্যস্ত হইত। বালক এবারও অভিমানপূর্ব্বক শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মহত্যার জন্য বাড়ীর পুষ্করিণীতে ঝাঁপিয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, পুষ্করিণীর জল গভীর হইলেও বালকের নিকট উহা জানুপ্রমাণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার পক্ষে ডুবিয়া মরা সম্ভবপর হইল না। সে যেদিকে যায়, সেইদিকে হাঁটুজল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ে। যথাসময়ে ঠাকুরের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে পরিবারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিতে পায় এবং বালক ও ঠাকুরকে লইয়া গৃহে চলিয়া আসে।

বণ্ডুলে চট্টোপাধ্যায় বাড়ীর নিকটে বঙ্কিম কুণ্ডু নামক একটি লোক বাস করিত। তাহার ছেলের সহিত ভোলানাথের অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। বঙ্কিম কুণ্ডুর ছেলে যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখন

ভোলানাথ শ্যামসুন্দরের স্নান-জল তাহার কপালে ও মুখে দিয়া তাহার আরোগ্য সম্পাদন করে।

একবার কাকা ভোলানাথকে একখানা কাপড় কিনিয়া আদর করিয়া পরিতে দিয়াছিলেন। চঞ্চল বালক খেয়ালের বশে কাপড়খানা হাত দিয়া ধরিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। উহা দেখিয়া কাকা বালককে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। বালক একটু দুঃখিত ও একটু বিস্মিত হইয়া ঐ ছিন্ন বস্ত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিতেই উহা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বালকের দেবাংশে জন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার ভোলানাথের কাকা তাহাকে পাঁচ টাকা দামের একজোড়া 'কোম্পানীর জুতা' খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন। বালক ঐ জুতা পাইয়া নিজে ব্যবহার করে নাই,—উহা তাহাদের প্রতিবেশী শশী কর্ম্মকারের পুত্রের বিবাহে দান করিয়াছিল। শশী কর্ম্মকারের পুত্র ভোলানাথের খেলার সাথী ছিল। তাই ভোলানাথ আপন বন্ধুর উৎসব উপলক্ষে ঐ মূল্যবান্ জুতা জোড়া উপহার স্বরূপ না দিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহাতে কাকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বালককে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। সেকালে পাঁচ টাকা দামের জুতা বড় সহজ সামগ্রী ছিল না, এমন জিনিষ নিজে ব্যবহার না করিয়া একজন বাহিরের লোককে দান করা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়াই বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ বাবু গণনা করিয়াছিলেন। এই তিরস্কারে ভোলানাথের মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, বাড়ীর চাকরাণীর

নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইয়া বালক চাকরের কাঁধে চড়িয়া বর্দ্ধমান গমন করে ও সেখান হইতে ঐ টাকা দ্বারা কয়েক ফাইল কুইনাইন আনিয়া গ্রামে খুচরা বিক্রয় করে। তাহাতে বহু টাকা লাভ হয়। ঐ টাকা হইতে চাকরাণীর ধারের টাকা দ্বিগুণ সুদসহ শোধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং বাকী টাকা দ্বারা জুতা খরিদ করিয়া গ্রামের সকলকে বিতরণ করা হয়।

ছয় মাস বয়সের সময় ভোলানাথের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার পিতৃব্য তাহার পিতৃস্থান অধিকার করেন ও তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। বাল্যকালে তাহার পিতৃব্য তাহাকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক তাড়না সহ্য করিয়াও বালক ইংরেজী শিক্ষা করিতে সম্মত হয় নাই। সংস্কৃতের উপর বালকের বিশেষ অনুরাগ ছিল। শুনিতে পাই, নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ভোলানাথ কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিল।

ভোলানাথের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতৃব্য পরলোক গমন করেন। তখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল —কিন্তু বালকের চক্ষে এক ফোঁটা জল কেহ দেখিতে পায় নাই। ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। বাল্য হইতেই যে মায়ার প্রভাব তাহার উপর কম ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শুনিতে পাই, প্রায় তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক কাপড় পরিতে চাহিত না, পরাইয়া দিলে উহা কাহাকেও দান করিয়া

দিত। কাকা তিরস্কার করিলে বলিত,—কাপড় না পরিয়া উলঙ্গ থাকিলেই বা দোষ কি ?—বৃথা আবরণ কিসের জন্য ?

এই সব ঘটনা অতি-ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা হইতে ভাবী জীবনের ধারার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের মহত্ত্ব ও গৌরব দীর্ঘ সাধনার ফল, মানুষ যে জন্মজন্মান্তরের তীব্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ উদ্যমের পরিণতি স্বরূপ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য অতীত সাধনার নিদর্শন এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধির সূচক। যাঁহারা বাল্যকালে ভোলানাথকে অন্তরঙ্গভাবে জানিতেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

বালকের মাতৃভক্তি শৈশব হইতেই অতি প্রবল ছিল। এরূপ অসাধারণ মাতৃভক্তি এ জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাবাজী বলেন যে, তাঁহার জীবনের সকল প্রকার উন্নতি জননীর আশীর্ব্বাদে সম্পন্ন হইয়াছে। একবার তাঁহার বাল্যকালে মাতাঠাকুরাণী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিজ গ্রামের ও আসন্ন চাতুষ্পার্শ্বিক গ্রামের চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত ছিল। চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভালই হইয়াছিল, শুশ্রূষারও ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু চিকিৎসার প্রভাবে রোগজনিত বিকার কিছুমাত্র উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। যতই দিন কাটিতে লাগিল, ততই রোগের অবস্থা সংশয়াপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসকগণ যত্ন-সহকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া লক্ষণ বিশেষ খারাপ বলিয়া মনে করিলেন—এমন কি, দিনটি যে

ভাল ভাবে কাটিবে তাহাতেও তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। ভোলানাথের কাকা ও খুড়ীমা তাহাকে আদর করিয়া 'ক্ষেপা খুড়ো' বলিয়া ডাকিতেন। বালকের কথা কখনই মিথ্যা হইত না বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। খুড়ীমা ভোলানাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্ষেপা খুড়ো, বল দেখি দিদি সারিবেন কি না?" সংসারানভিজ্ঞ সরল বালক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বলিল, "সারিবেন"। বিসূচিকা কি ভয়ঙ্কর রোগ, তাহার মাতার অবস্থা কি প্রকার সঙ্কটাপন্ন, সরল হৃদয় বালকের সে বোধ ছিল না। সে সংসারে আসিয়া অতি-শৈশবেই পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র মাতার অঙ্কেই লালিত-পালিত হইয়াছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে মা ভিন্ন বালকের সংসার-ক্ষেত্রে অন্য কোনও আকর্ষণের বস্তু ছিল না, সে যে কখনও মাতৃহারা হইতে পারে, এ ধারণা তাহার মনে কখনই জাগিত না, তাই দিগ্‌বিদিক্ বিচার না করিয়া ঐ প্রকার উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু এদিকে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল, বাড়ীর সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, জীবনের যা একটু ক্ষীণ আশা ছিল, তাহাও ক্রমশঃ নিবিয়া গেল—আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া শুধু রোগীর মুখমণ্ডলে নহে, গৃহস্থিত সকলেরই মুখে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বালক একবার জননীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, একবার আত্মীয় স্বজনগণের গাম্ভীর্য্য ও বিষাদক্লিষ্ট গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহার হৃদয় যেন অবশ্যম্ভাবী বিপদের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। মাতৃভক্ত মাতৃগতপ্রাণ বালক আজ ভাবিতে পারিতেছে না যে, তাহার

জননী তাহাকে অনন্ত কালের জন্য ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা নূতন দেশে চলিয়া যাইবে,—সে মাতৃহীন হইবে। বালকের বড় অভিমান হইল,—সে যে-সব ঠাকুর-দেবতার পূজা করিত স্বভাবতঃ তাহাদেরই উপর তাহার অভিমান হইল। বালকের চক্ষুঃ ছলছল করিতেছে, বক্ষঃস্থল গুরুতর বেদনায় নিপীড়িত, কিন্তু কাহাকেও না বলিয়া, নিজের অন্তরের বেদনা কাহাকেও না জানিতে দিয়া, সে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল,—গৃহের পার্শ্বে একটি গো-শালা ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিয়া উহার মঞ্চের উপরে যেখানে ঘুঁটে প্রভৃতি সঞ্চিত রাখা হইত সেই অন্ধকার গুপ্তস্থানে একখানা শাবল লইয়া অতি সাবধানে পলাইয়া রহিল। সে মনে মনে ভাবিতেছে—আজ তাহার পরীক্ষার দিন,—এতদিন যে সকল ঠাকুর দেবতাকে সরলভাবে ডাকিয়াছে আজ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় কি না। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে রাত্রের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর ভাঙ্গিয়া ঠাকুর ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। বালক উক্তভাবে গো-শালায় বসিয়াছিল, গৃহস্থিত সকলে রোগীকে লইয়া ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহার কোন খোঁজ করিতে পারে নাই। ভগবানের কৃপায় ক্রমে রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল ও চিকিৎসকও আশ্বাস দিলেন। সন্ধ্যাবেলায় বালকের সন্ধান হইল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। এদিকে শাবলও নাই। খুড়ীমা গোয়ালে আসিয়া শাবল খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু ভোলানাথকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যাবেলায়

মশার জন্য ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিতে রাখালকে মাঁচা হইতে ঘুঁটে আনিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, তখনই বালক ধরা পড়িয়া গেল। বালকও মাতার আরোগ্য-সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় মা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুপ্তধন ঠাকুর-ঘরে স্থানবিশেষে প্রোথিত আছে, কিন্তু বালকের তাহাতে কোন প্রকার লোভ উৎপন্ন হয় নাই।

নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপনয়নের পরে সাবিত্রী দেবীর প্রভাবে বালকের স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ভোলানাথ বণ্ডুলে শিবলিঙ্গের মধ্যে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। শিবলিঙ্গ আপনিই দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে বালক যুগল-মূর্ত্তি ও অন্যান্য দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষের জীবনের পরিবর্ত্তন কাহার যে কি উপলক্ষ্য করিয়া সংঘটিত হয় তাহা বলা যায় না। লূতাতন্তুর ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-সূত্রের উপর অতি-বৃহৎ ও অতি-জটিল জীবনের সৌধ বিলম্বিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম, ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা স্বভাবের প্রেরণা একই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় মহাশক্তির কল্পিত পৃথক্ পৃথক্ নাম মাত্র। লৌকিক ঘটনাবলীকে নিমিত্তরূপে অবলম্বন করিয়া এই মহাশক্তি কাহার জীবন কি-ভাবে নিয়মিত করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। লৌকিক কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইলেও অজ্ঞেয় মূল কারণের তুলনায় তাহা একপ্রকার উপেক্ষার যোগ্য,—যাহাকে আমরা অতি-দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করি, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সূচনা করিয়া থাকে। মহামায়ার মঙ্গলময় বিধানে আপাত-প্রতীয়মান অশুভও চরমে মহামঙ্গলের বিগ্রহরূপে পরিণত হয়। এইরূপ একটি আকস্মিক অশুভ ঘটনা ভোলানাথের জীবনকে চিরদিনের জন্য নূতন পথে চালিত করিতে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। এখন প্রসঙ্গতঃ সেই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

তখন ভোলানাথের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়াছে মাত্র, কৈশোরের অবসান তখনও হয় নাই। একদিন সিঁড়ি হইতে নামিবার সময় অকস্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত কুকুর আসিয়া

বালকের পাদদেশে দংশন করিল। বালক অন্যমনস্ক ভাবে নামিতেছিল, হঠাৎ এই প্রকারে কুকুরে দংশন করিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। দংশনের ক্রিয়া অতি-অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হইতে লাগিল,—বালকের সমস্ত দেহ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িল। বালক বাড়ীর সকলের নিকট দংশনের ইতিহাস বর্ণনা করিল। তাহার দাদা চিকিৎসক ছিলেন; তিনি নিজে অন্যান্য ডাক্তার ও বৈদ্যগণের সহায়তা লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসা সত্ত্বেও বালকের অবস্থা অনতিবিলম্বেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িল। স্থানীয় চিকিৎসাতে বিশেষ কোন ফলাধান হইল না দেখিয়া বালককে গোঁদলপাড়ায় লইয়া যাওয়া হইল ও সেখানকার প্রসিদ্ধ ঔষধ সেবন করান হইল। কিন্তু তাহাতেও উপকার বুঝিতে পারা গেল না। এদিকে বিষের ক্রিয়া ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—রোগের জ্বালায় সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোঁদলপাড়া হইতে বালক হুগলীতে চলিয়া আসে। সেখানে একটি ময়দার কলের স্বত্বাধিকারী, তাহার কাকার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতেই সে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুগলীতেও রোগের প্রতীকার চেষ্টা কম হয় নাই, কিন্তু সবই বৃথা। বালক হতাশ হইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল—এবার তাহার রক্ষা নাই।

তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্ত-গমন করিয়াছেন, পশ্চিমাকাশে রক্তরাগচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে ও ভাগীরথী-সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাগর্ভকে

রঞ্জিত করিয়াছে। ঈষৎ বায়ু-হিল্লোলে গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী খেলিতেছিল, বালক একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া আনমনে তাহাই দেখিতেছিল। ঐ পবন-হিল্লোলে সঞ্চালিত তরঙ্গমালার ন্যায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত-শত আশা ও আকাঙ্ক্ষার লহরী-মালা উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল তাহার ইতিহাস কে জানে? অস্তোন্মুখ সূর্য্য দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহার জীবন-সূর্য্যও অস্তমিত-প্রায়। বালক কি জানি কি মনে করিয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে ভাগীরথীর তটদেশে আগমন করিল—বোধ হয় তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, স্নিগ্ধ-সলিলা জাহ্নবীর শীতল বক্ষে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। কিন্তু গঙ্গাতটে আসিয়া সে যে-দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহাতে সে চকিত হইল, তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সে অনিমেষলোচনে ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, গঙ্গাবক্ষে একজন জটাজুটধারী সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী নিরন্তর উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিতেছেন,—আর গঙ্গাজল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের ন্যায় স্ফীত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডল প্রশান্ত, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল অথচ মধুর, দেখিলেই মনে হয়, যেন অপার্থিব জ্ঞান ও করুণা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া, দুঃখ-পীড়িত ধরণীর উদ্ধার কামনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সন্ন্যাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ,—তাঁহার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কিছুই নাই। তিনি বালকের দিকে নিরীক্ষণ মাত্র তাহার সমস্ত ইতিহাস ও মনোবেদনা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বালককে গম্ভীর ও

স্নিগ্ধস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাচ্ছা! ইতনা ক্যোঁ ঘাবড়াতে হো? দরদ হোতা হৈ? অচ্ছা, হম্ সব অচ্ছা কর দেংগে।" বলিয়া তীরে উঠিলেন এবং বালকের শিরোদেশে করস্থাপন করিলেন। তাঁহার হস্ত-স্পর্শমাত্রই বালকের মনে হইতে লাগিল, কত বরফের রাশি যেন তাহার মস্তকে চাপা রহিয়াছে। তাহার শরীরের প্রতি শিরায় ও ধমনীতে তপ্ত শোণিতের পরিবর্ত্তে যেন সুশীতল অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইতেছে,—তাহার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া গেল। মৃত্যু-ভয় ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গেল, জীবনে নূতন আশার সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসী বালককে ঐখান হইতেই একটি ঔষধ লইয়া খাওয়াইয়া দিলেন ও তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। বালক বাসায় আসিল। তখন তাহার রোগ-যন্ত্রণা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। সে দ্বিতীয় দিন গঙ্গাতীরে গেল, মহাপুরুষের নিকট বিনীতস্বরে প্রার্থনা করিল,—"প্রভো! আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন, আপনাকে আমি ছাড়িতে পারিব না। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন ও ধর্ম্ম-জীবনের পথ প্রদর্শন করুন।" মহাপুরুষ তাহাকে একটি আসন শিখাইয়া একটি বীজ দিলেন। বলিলেন,—"বালক, আমি তোমার গুরু নহি। এই আসনটি অভ্যাস কর ও এই বীজ জপ কর,—ইহা হইতেই তোমার দেহ-শুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার গুরু নহি। যিনি তোমার গুরু হইবেন তিনি এখন স্থানান্তরে বর্ত্তমান আছেন, তিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন —তাঁহার কৃপায় তোমার সকল অভাব দূরীভূত হইবে এবং তুমি

ধর্ম্ম-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নিজের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। তুমি এখন বাড়ী যাও—আমি গঙ্গাসাগরে যাইতেছি। সময় হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাইব। এখন নিশ্চিন্ত থাক।"

বালক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ীর দিকে আসিল। বাড়ী আসিবার পরে কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রস্রাবের সঙ্গে ছোট ছোট কুকুরের ছানার মতন পড়িয়াছিল। তখন হইতেই বালক সম্পুর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। মা পুত্রের নিকট তাহার অলৌকিক ভাবে আরোগ্য লাভ করিবার ইতিহাস শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

মহাপুরুষের চলিয়া যাওয়ার পরে দুই এক বৎসর কাটিয়া যায়। তখন ভোলানাথ বর্দ্ধমান কাঞ্চননগর মেসে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সঙ্গে তার মাসতুত ভাই থাকিত। একদিন বিশ্বরূপ সাধু নামক একজন দোকানদারের নিকট সে কুইনাইন ক্রয় করিবার জন্য গিয়াছিল। সেখানে একটি মুসলমানের নিকট শুনিতে পাইল যে, ঢাকাতে একজন অসাধারণ সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় জলে থাকেন— জলে বারংবার উঠা-নামা করেন, জল হইতে উঠিবার সময় জলরাশি স্তম্ভাকারে তাঁহার সহিত উত্থিত হয়; আবার নামিবার সময় নামিয়া মিলাইয়া যায়। মুসলমানটির মুখে এই কথা শুনিবামাত্র ভোলানাথের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কালবিলম্ব না করিয়া সে ঢাকা অভিমুখে প্রস্থান করিল। বর্দ্ধমানে হরিপদ নামক

একটি যুবকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল—সেও ভোলানাথের সঙ্গে একত্র রওনা হইল। ঢাকাতে পৌঁছিয়া উভয়ে সেই অলৌকিক সন্ন্যাসীর দর্শন-লালসায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে রমনার মাঠে একটি বিজন স্থানে সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভোলানাথ দেখিবা-মাত্রই চিনিতে পারিল—ইনি তাহার প্রাণদাতা সেই হুগলী ঘাটের সন্ন্যাসী। ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল—"প্রভো! এবার আমাকে গ্রহণ করুন; আর প্রত্যাখ্যান করিবেন না।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"একাকী না আসিয়া সঙ্গে আর একজন লোক আনিয়াছ কেন?" যাহা হউক, এই বলিয়া তিনি উভয়কেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য যে সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমভাবে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্য ভিন্ন জীবন গঠিত হয় না, সাধন-সম্পত্তি আয়ত্ত হয় না ও নিত্যধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সামর্থ্য জন্মে না। বিষয় বাসনাতে আবদ্ধ জীব ভোগ-লোলুপ—ত্যাগের মহিমা সে কি বুঝিবে? বস্তুতঃ অমৃতত্ব লাভের ইহাই একমাত্র সোপান। একদিন জীবকে ইহা বুঝিতে হইবে—বুঝিয়া অনিত্যের সেবা ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য,—যে কোন মহাত্মার জীবন-চরিত্র আলোচনা করা যায়, সর্ব্বত্রই একই কথা দেখিতে পাই।

আজ একটি নবীন যুবক ঐ সনাতন ত্যাগের পথ লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় অনন্তের দিকে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ তাহার হৃদয়ে কি অপার্থিব ভাবের উদয় হইয়াছে, মোহান্ধ সংসারী জীব তাহা হয়ত বুঝিতে পারিবে না। জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে, কত কত সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে, ভগবানের কৃপাতে আজ যুবকের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে ক্ষিপ্ত কুকুর-দংশন নিমিত্ত মাত্র। বিমাতার অপমানকে নিমিত্ত করিয়া একদিন ধ্রুব অনন্তপুরুষের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। যুবক ভোলানাথেরও আজ সেই

অবস্থা। স্নেহপূর্ণ আত্মীয়-স্বজন, স্নেহময়ী বাৎসল্যশালিনী জননী, চিরপরিচিত গৃহ ও পরিবার, ক্রীড়া-পরিকর, পার্থিব আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সকল বিসর্জ্জন দিয়া আজ সে একজন অজ্ঞাত ও অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তদপেক্ষাও অজ্ঞাত ও অপরিচিত পদার্থের অনুসন্ধানে কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

মহাপুরুষ ভোলানাথের মনঃ পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"তুমি কি আমার সঙ্গে দুর্গমস্থানে যাইতে সাহস কর? তুমি এখনও বালক—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি নিতান্তই যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সন্ধ্যার পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও—আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া ভোলানাথ যার-পর-নাই হৃষ্ট হইল। যথাসময়ে সে ও তাহার সঙ্গী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত সম্মিলিত হইল। সন্ন্যাসী তাহাদিগের চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নিজের পশ্চাতে থাকিয়া চলিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী নৈশ-অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া ধীর-পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—যুবকদ্বয় তাঁহার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল, কি ভাবে কোন্ দিকে চলিল তাহা ভোলানাথ কিংবা হরিপদ কেহই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল না। শুধু মনে হইতে লাগিল, একটি কোমল-স্পর্শ আস্তরণের উপর দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। যদিও তাহারা স্বাভাবিক প্রণালীতেই পদক্ষেপ করিয়া চলিতেছিল, তথাপি বেশ বুঝিতে

পারিতেছিল যে, কোন অনৈসর্গিক শক্তির আকর্ষণে তাহারা ব্যোমপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। জলের উপরে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন জলচর প্রাণী অথবা জলবিহারী পোতাদি সঞ্চরণ করে, বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ করিয়া স্তরে স্তরে বায়ুর লহর ভেদ করিতে করিতে যেমন বায়ুযান অথবা ব্যোমচারী বিহঙ্গাদি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাহারাও তেমনি চলিতেছিল। যদিও উভয়ে হাঁটিয়াই চলিতেছিল এরূপ বোধ হইতেছিল বটে, তথাপি তাহা যে সাধারণ ভ্রমণের অনুরূপ নহে তাহা তাহারা অচিরেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর প্রভাত হইলে মহাপুরুষ যুবকদ্বয়ের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। তখন চারিদিকে তাকাইয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল—একটি পর্ব্বতের সমীপে দেবায়তনের পার্শ্বে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চারিদিকে একটিও বাঙ্গালী দেখিতে না পাইয়া তাহারা অনুমান করিল, তাহারা অতি দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল, এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল এবং এই দেবায়তনের মধ্যস্থা দেবী স্বয়ং বিন্ধ্যবাসিনী। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে একরাত্রের মধ্যে নদী ও পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া কি করিয়া যে তাহারা এতদূর পদব্রজে আসিতে পারিয়াছে ইহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিল না। তাহাদিগকে অষ্টভুজা মন্দিরের প্রান্তদেশে রক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবর অন্তর্হিত হইলেন। তিনি যাওয়ার সময়ে বলিয়া গেলেন যে, কোন প্রকার ভয়ের

কারণ নাই এবং তিনি কয়েকদিন পরে আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন।

সন্ন্যাসীর অন্তর্ধানের পর ভোলানাথ ও হরিপদ উভয়েই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা কখনই দূরদেশে প্রবাস-যাত্রা করে নাই, কাজেই এই প্রকার জনমানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানিত না, অথচ যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে বঙ্গভাষা-ভাষী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ক্বচিৎ কখনও যে দুই-একজন লোক দেবীর দর্শন উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইত তাহারা সকলেই হিন্দী-ভাষী—উহাদের ভাষা উভয়ের নিকটেই সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তাহার পর অদূরে চারিদিকেই নিবিড় বনভূমি দর্শন করিয়া হিংস্র জন্তুর আশঙ্কায় তাহাদের প্রাণে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, এই প্রকার উৎকণ্ঠায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর একজন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ উভয়ের উপযোগী আহার্য্য বস্তু সঙ্গে করিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কে এবং কোথা হইতে কাহার আদেশে আসিয়াছেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ ভোজ্য বস্তু রাখিয়া চলিয়া যাইবার পর উভয়ে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া সেখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঐ ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার আসিয়া তাহাদিগকে খাদ্য বস্তু দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভোলানাথ মনে করিয়াছিল, তাহার সঙ্গী মহাত্মা সন্ধ্যাবেলা আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও তিনি আসিলেন না দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহার মনঃ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। অপরিচিত দেশে বিজন পর্ব্বত-শিখরে মুক্ত আকাশের নিম্নে ঘোর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের সন্নিকটে নৈশ অন্ধকারে কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করিবে, তাহা ভাবিয়া সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পরে মনঃ স্থির করিয়া একটি বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া নিজের দেহ বৃক্ষের শাখার সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল। তাহার দেখাদেখি তাহার সঙ্গীও নিজেকে ঐ ভাবে বাঁধিয়া রাখিল।

এই প্রকারে অতি কষ্টে উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে উভয়ে কোন প্রকারে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিল ও রাত্রি প্রভাত হইলে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অষ্টভুজা মন্দিরে যাইয়া স্থান গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় দিনও প্রথম দিনের মতই যথাসময়ে কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণটি আসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া চলিয়া গেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা বনমধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া তাহারা যার-পর-নাই বিহ্বল হইয়া পড়িল। ভোলানাথ কোন দিন মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হয় নাই। আজ এই বিদেশে বিভূমে সে নিজেকে নিতান্তই নিরাশ্রয় মনে করিয়া কাতর হইয়া পড়িল—অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল, সুখময়ী গৃহ-স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। যুবক মনে মনে নিশ্চয় করিল, আজ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহার নিস্তার

নাই। এই প্রকার চিন্তা, ভয় ও উৎকণ্ঠায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সে সুদূর পশ্চিমাকাশে তাকাইয়া দেখিতে পাইল যেন একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক শূন্যপথে তাহারই দিকে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। নবোদিত সূর্য্য কিংবা পূর্ণচন্দ্র যেমন অখণ্ডমণ্ডলাকারে অভিব্যক্ত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, তদ্রূপ ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলটিও তাহার দৃষ্টির অগ্রভাগে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যতই উহা সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই উহার আকারগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যপথে পতিত হইতে লাগিল। যুবকদ্বয় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। আরও নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিতে পারা গেল, যাহা দূর হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল তাহা বস্তুতঃ জ্যোতির্ম্মণ্ডল নহে,—একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ও তাহার প্রভামণ্ডল মাত্র। মূর্ত্তিটি শূন্যপথে অবতীর্ণ হইয়া যুবকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মূর্ত্তির শিরোদেশে জটাজুট, হস্তে ত্রিশূল, ললাটে রক্তচন্দনের বিন্দু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ও মুখে স্নিগ্ধ ও করুণাপূর্ণ হাস্য-রেখা শোভা পাইতেছিল। মূর্ত্তিটি একটি সিদ্ধ ভৈরবীর মূর্ত্তি। ভৈরবী মাতা দয়ার্দ্রস্বরে ভোলানাথকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতে বলিলেন,—"বৎস, তুমি এত কাঁদিতেছ কেন? আমি তোমার কান্না দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া তোমার নিকটে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।" এই বলিয়া তাহাকে কোলে লইয়া জননীর ন্যায় বাৎসল্য-সহকারে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আপনি কে ও কোথায় থাকেন? আমার কান্না কি প্রকারে

বুঝিতে পারিলেন ? কি ভাবেই বা আপনি এখানে আসিলেন ? আমি ত অবাক্ হইয়া গিয়াছি।" ভৈরবী বলিল—"ভোলানাথ, প্রকৃতির রহস্য তোমার নিকট দুর্ভেদ্য। আমি কে, তাহার পরিচয় এখন দিব না—সময়ে আমাকে চিনিতে পারিবে। তবে জানিয়া রাখ, আমি তোমার জননী-তুল্য এবং তুমি আমার সন্তান-সদৃশ। আমি যেখানেই থাকি, তুমি আমার কাছেই আছ। তুমি সদাই আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছ। ভয়ের কোন কারণ নাই। যিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন আমিও তাঁহারই সম্প্রদায়-ভুক্ত। তিনি মহাপুরুষ—সময়ে তাঁহার দেখা পাইবে। আজ হইতে আর তুমি ভয় পাইবে না। তবে যদি কখনও ব্যাকুল হও, আমি আবার দেখা দিব—আমাকে সংবাদ দিতে হইবে না। স্মরণ করিবামাত্রই আমার দর্শন পাইবে। এখন আসি।" এই বলিয়া ভৈরবী মাতা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল—এই ভৈরবী মাতার নাম উমা ভৈরবী।

বিন্ধ্যাচলে পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইলে আবার সেই মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার জানিতে পারা গেল—তাঁহার নাম পরমহংস নীমানন্দ স্বামী। তিনি এবারও পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে চক্ষুঃ বাঁধিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে একটি আশ্রম ছিল,—সেখানে বহুসংখ্যক সাধু মহাত্মা সমবেত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলানাথ ও হরিপদকে সেখানে রাখিয়া মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। আবার একদিন

আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তুকলী পাহাড়ে গেলেন। তখন সেখানে একটি গুহাতে শ্যামা ভৈরবী মাতা অবস্থান করিতেছিলেন। যুবকদ্বয় একদিন মাত্র সেখানে থাকিলেন। ভৈরবী মাতা উভয়ের খুব যত্ন করিলেন ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে মহাপুরুষ আসিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সন্ধ্যার পরে রওনা হইলেন—রাত্রি প্রভাত হইতেই যুবকদ্বয় চক্ষুঃ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন—এক অপূর্ব্ব-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—উত্তরাপথের মধ্যে এ একটি প্রসিদ্ধ অথচ অতি-দুর্গম যোগাশ্রম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা নীল মেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে, মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণী ও গিরিনদী ঝঙ্কার সহকারে প্রবাহিত হইতেছে। উপত্যকার মধ্যস্থলে প্রায় ৭।৮ মাইল স্থান ব্যাপিয়া একটি বিরাট্ আশ্রম। আশ্রমের চারিদিকে প্রাকার বেষ্টন, প্রাকারের চারিদিকে জলপূর্ণ পরিখা, বাহিরের সঙ্গে যাতায়াতের জন্য পরিখার উপরে একটি রমণীয় ধনুরাকার সেতু। আশ্রমটি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত,—শিক্ষার ক্রম অনুসারে স্তরগুলি সজ্জিত। আশ্রমে যোগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। দীক্ষার পরে শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবস্থার অধিকাংশ সময় এইস্থানে সকলকেই অতিবাহিত করিতে হয়। বিজ্ঞানের বিভাগটি স্বতন্ত্র—তাহা সম্পূর্ণরূপে একজন পৃথক্ আচার্য্যের অধীন। তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরমহংস। আশ্রমের মুখ্য অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ পরমহংস। এই স্থানটি অতি পুরাতন, প্রবাদ আছে ইহার প্রাচীন নাম—"ইন্দ্রভবন" ছিল। পরে ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন স্থানের সংস্কার করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী ইহার ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এখনও তিনিই ইহার মুখ্য অধিষ্ঠাতা আছেন। এখানে বহুসংখ্যক লোক অবস্থান করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী উল্লেখযোগ্য—

১। ব্রহ্মচারী যুবক।

২। কুমারী। ইঁহারাও ব্রহ্মচারিণী।

৩। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী। ইঁহাদের অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। সিদ্ধ পরমহংস। এই শ্রেণীর যে সকল মহাত্মা এখানে আছেন তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইঁহাদের বয়ঃক্রম খুব অধিক—এত অধিক যে সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্য নহে। ২০০।৩০০ হইতে সহস্রাধিক বৎসরের লোকও এখানে বর্ত্তমান আছেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই 'আহার' করেন না—তবে যাঁহারা ততটা উৎকর্ষ লাভ করেন নাই তাঁহারা সামান্য কিছু গ্রহণ করেন মাত্র।

ভোলানাথ ও হরিপদ জ্ঞানগঞ্জে ৮।১০ দিন থাকিলে পূজ্যপাদ নীমানন্দ স্বামী আপন গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ মহাতপার নিকটে তাহাদিগকে লইয়া যান ও তাঁহার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহাতপার বয়স প্রায় ১২০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একজন অতি-শক্তিশালী মহাযোগী পুরুষ। তিনি সাধারণতঃ উক্ত যোগাশ্রমে থাকেন না। তাঁহার কোন আশ্রম নাই। তিব্বতে যে স্থানে তিনি থাকেন সেখানে একটি গুহা আছে—তাহাতে ৺রাজরাজেশ্বরী দেবীর পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন, তাই তাহাকে 'রাজরাজেশ্বরী মঠ' বলা হয়। বস্তুতঃ সেখানে ঘর-বাড়ী কিছুই নাই। সেখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ঘর-বাড়ীর আবশ্যকতাও নাই। মহর্ষি মহাতপাঃ অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করেন—কদাচিৎ

যোগাশ্রমে আসেন। কখন কখন আপন গুরু-মাতা ক্ষেপামাইর নিকট মনোহর-তীর্থেও গমন করেন। হিমবৎ প্রদেশে উক্ত যোগাশ্রমের ন্যায় আরও কয়েকটি মঠ আছে। সেগুলিও রাজরাজেশ্বরীর শাসনভুক্ত। মহর্ষি সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা বড় বলেন না, সর্ব্বদাই আপনভাবে বিলীন থাকেন,—বাহ্য জগতের কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীমদ্‌ভৃগুরাম পরমহংসদেব ঐ সকল মঠের প্রধান অধিষ্ঠাতা ও কার্য্যকর্ত্তা। তিনি পরিদর্শক, নিয়ামক, পরীক্ষক—একাধারে সবই।

আমরা পরমহংস নীমানন্দ, শ্যামানন্দ ও জ্ঞানানন্দের কথা বলিয়াছি—তাঁহারা এই ভৃগুরাম স্বামীরই গুরুভ্রাতা। তবে যোগৈশ্বর্য্যে ভৃগুরাম স্বামী একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহর্ষি মহাতপাঃ ভোলানাথকে শিরঃস্পর্শ পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া বীজমন্ত্র দান করিলেন—দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। আজ ভোলানাথের জীবন সার্থক হইল—ক্ষিপ্ত-কুকুরের দংশনে একদিন যাহার জীবনান্তকাল প্রায় উপস্থিত হইয়াছিল আজ তাহার নিকট ভারতের একজন অতি-বড় সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুগ্রহে চিদানন্দময় অনন্ত জীবনের দ্বার খুলিয়া গেল—অমরতার পথ প্রকাশমান হইল,—শাপ বরে পরিণত হইল।

আজ হইতে ভোলানাথের নবজীবনের সূত্রপাত হইল,—দেহবেধের ক্রিয়া আরব্ধ হইল। প্রাকৃত জীবন অপ্রাকৃত স্পর্শমণির স্পর্শে কাঞ্চনাভা ধারণ করিল। এতদিন যে যুবক অসাধারণ হইলেও সাধারণ শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল, আজ

গুরুকৃপায় সে সত্য-সত্যই অসাধারণতা প্রাপ্ত হইল। আজ নবীন জীবনের সন্ধিক্ষণে আমরা এই দিব্যধামের যাত্রীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি।

দীক্ষান্তে শিক্ষার জন্য কিছুদিন যোগাশ্রমে অবস্থান করিতে হয়। ওখানকার শিক্ষাপ্রণালী অতি-বিচিত্র। পরমহংস শ্যামানন্দের নিকট ভোলানাথ সূর্য্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও পরমহংস ভৃগুরাম স্বামী তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী। বহু বৎসর পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়, অসীম ধৈর্য্য ও বিপুল পরিশ্রম সহকারে ভোলানাথ বিজ্ঞান ও যোগ উভয় বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

বিজ্ঞানের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় জড়-বিজ্ঞান। বস্তুতঃ জড় বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহাও একান্তভাবে জড় নহে। 'বিশিষ্ট-জ্ঞানই' বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তথাকথিত জড় ও চেতন। উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়।' সূর্য্য ইহার কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান আশ্রয় বলিয়া ইহাকে সূর্য্য-বিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে যে, এমন একটি পদার্থ আছে যাহার জ্ঞান লাভ করিলে সর্ব্ব-বিষয়ক বিজ্ঞান স্বতঃই উপলব্ধ হয়। শ্রুতির এই অনুশাসন ব্রহ্মবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে বিজ্ঞানের স্বরূপ কি, কি উপায়ে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা যিনি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি জানেন যে সূর্য্যই সকল প্রকার বিজ্ঞানের মূলস্তম্ভ। সৃষ্টি স্থিতি

সংহার—এক কথায় জাগতিক ও ব্যাবহারিক যাবতীয় ব্যাপারই সূর্য্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রসার সূর্য্য হইতেই হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। সূর্য্যই দেবযান পথের লক্ষ্যস্বরূপ। ইহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান—স্বরূপোপলব্ধি—করিতে হইলে সৌরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ একান্তভাবে আবশ্যক। অতএব যোগের যাহা চরম উদ্দেশ্য বিজ্ঞানেরও তাহাই। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞানও এক প্রকার মহাযোগ এবং যাহাকে আমরা যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, মূলতঃ তাহাও বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু নহে। শুধু প্রণালীতে ভেদ আছে মাত্র। সুতরাং সাধকের পক্ষে উভয়ই সমভাবে আবশ্যক। যোগপথে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানপথে যোগ পরম সহায়ক।

সূর্য্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে অন্যান্য বিজ্ঞান—যাহা উহারই অঙ্গমাত্র—সহজেই আয়ত্ত হয়। যোগশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামক বিশিষ্ট সিদ্ধি যেমন যাবতীয় খণ্ডসিদ্ধির চরম উৎকর্ষ, বিজ্ঞান-রাজ্যে সৌর-বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, দেব-বিজ্ঞান প্রভৃতি সৌর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত খণ্ড-বিজ্ঞান-বিশেষ।

ভোলানাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে যোগ ও বিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রবীণতা লাভ করেন। এরূপ মণিকাঞ্চন-যোগ অন্যত্র দুর্লভ। প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে শিক্ষার যে উৎকর্ষ

ছিল তিনি গুরুকৃপা ও স্বীয় অধ্যবসায়-বলে তাহাই উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাই জগৎ, জগদীশ্বর ও অনাদি মহাশক্তির রহস্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—প্রাকৃতিক শক্তিমালাকে স্বকীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্য এবং নিজের মধ্যে কোনও প্রকার আবরণ থাকিতে দেন নাই। শুধু শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবাক্য আর্য হইলেও, একহিসাবে অভ্রান্ত হইলেও, পূর্ণজ্ঞান প্রসব করিতে পারে না। শুধু বাক্য হইতে বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না, আর প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে আবরণ ভঙ্গও হয় না। গুরূপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্তভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি যে গভীর সত্য হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে উপলব্ধি করিয়াছেন, যে সংশয়রহিত পরিপূর্ণ বিজ্ঞান-তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা শুধু গ্রন্থপাঠ দ্বারা সম্ভবপর হইত না।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বাদশবর্ষ কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া তিনি সাধনা করিয়াছেন। শিক্ষার জন্য বহুদিন হিমালয়ে থাকিয়া পরে অভ্যাসের জন্য নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন। এক-এক স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছেন। কখনও সঙ্গে সাথী থাকিত, কখনও থাকিত না। অনেক সময়ে ফলমূল খাইয়া থাকিতে হইত। সময়ে সময়ে আবার তাহাও জুটিত না; তখন কতদিন অনাহারেও থাকিতে হইয়াছে। নিবিড় বনে, গিরিগুহায়, শীতাতপ অগ্রাহ্য করিয়া, হিংস্র পশুর সঞ্চার-পথে প্রাণটি হাতে করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। লোকালয়ের নিকটে

থাকিলে ভিক্ষা-সংগ্রহের আদেশ ছিল বটে, কিন্তু ভিক্ষা চাওয়ার নিয়ম ছিল না। গৃহস্থের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষাপাত্র প্রদর্শন করিতে হইত—যদি সেখানে কিছু পাওয়া যাইত, ভালই। তাহা হইলে আর অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন ছিল না। অল্প হউক, অধিক হউক, উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু কিছু না পাওয়া গেলে গৃহান্তরে যাইতে পারিতেন; সেখানেও যদি কিছু না পাওয়া যাইত, তবে তৃতীয় গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু সেখানে কিছু না পাইলে আর চেষ্টা করিবার আদেশ ছিল না। সেদিন অনাহারেই থাকিতে হইত।

এ সকল শুধু ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার জন্য। আমরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে করি আমরাই কর্ত্তা—আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই সব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যে বিরাট্ শক্তি জগতের অন্তরে থাকিয়া অনন্যভাবে সমগ্র জগৎকে চালিত করিতেছেন, যাঁহার নিঃয়ন্ত্রণে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকে, তিলমাত্র কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে সমর্থ হয় না —যাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সন্তান-প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই তাহার আহারের জন্য মাতৃস্তন্যে অমৃত-ধারার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই বিশ্বজননী আনন্দময়ী মহাশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলে জীবের আর কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যখন সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, অন্তরে-বাহিরে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র তাঁহারই মঙ্গলময় সত্তা প্রত্যক্ষ হয়, তখন ক্ষুদ্র অহঙ্কার সূর্য্যালোকে নক্ষত্রপংক্তির ন্যায় কোথায়

যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় জীবন এমন ভাবে নিয়মিত করিতে হয়, যাহাতে সাধকের অহঙ্কার দমিত হইয়া প্রকৃত নির্ভরশীলতার উপলব্ধি ঘটিতে পারে। সাধক নির্ভরশীল হইতে পারিলে তাহার কোন ভয় বা উদ্বেগ থাকে না—ভগবান্ স্বয়ংই তাহার যোগ-ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী ভোলানাথের জীবনে এমন ঘটনা যে কতবার ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না।

আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, গির্নারে অবস্থানকালে একবার তিনদিন তাঁহাকে অনশনে থাকিতে হইয়াছিল। নিকটে কোথাও লোকালয় ছিল না—ভিক্ষা-সংগ্রহের কোন উপায়ও ছিল না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে দেহরক্ষার জন্য উৎকট পুরুষকার অবৈধ। তাই দূরে যাইয়া আহার্য্যের সংস্থান নিষিদ্ধ মনে করিয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে একটি গুহা মধ্যে শয়ন করিলেন। মনে হইল—এবার অনশনে দেহপাত অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এইরূপ পথহীন ঘোর বিজনভূমিতে—বিশেষতঃ যেখানে চতুর্দ্দিকে নিরন্তর শ্বাপদাদির সঞ্চার হইতেছে—কোনও পথিকের আকস্মিক সমাগমের সম্ভাবনা নাই। আর হলেও তাহার নিকটেও ত ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশা নিষ্ফল। ভোলানাথ নয়ন নিমীলিত করিয়া গুরুদত্ত ইষ্টনাম ধ্যান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার সমস্ত দেহে তন্দ্রার আবেশ হয়। তন্দ্রা হইতে উত্থিত হইয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, দশ পনেরটি মৃন্ময়পাত্রে নানাপ্রকার সুস্বাদ খাদ্য ও পানীয় তাঁহার

সম্মুখে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ক্ষীর, মুড়কী, চিড়া, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল, সুপেয় সরবত—এই সকল দেখিয়া তিনি জগদম্বার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে তিনদিন অনাহারে ছিলেন তাহা ত এ-জগতে কেহ জানিত না, জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই ভীষণ অরণ্যমধ্যে, গুহার অন্তঃপ্রদেশে, ঠিক তাঁহারই সম্মুখে, এই সকল খাদ্যবস্তু কে রাখিয়া গেল? খাদ্যবস্তুর মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গদেশের সুপরিচিত খাদ্য—সুদূর পশ্চিমে ইহাই বা কে আনিল? ইহা যে স্নেহময়ী বিশ্বজননীর স্নেহের নিদর্শন, তাহা অনুভব করিয়া তিনি প্রেম ও আনন্দে, গদগদ হইলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেক বার হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভোলানাথ মঠের নিয়মানুসারে দণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডী অবস্থাতে উন্নীত হইলেন। চারি বৎসরকাল দণ্ডধারণ পূর্ব্বক দণ্ড ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসাবস্থাতে প্রায় চারি বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই আট বৎসরকাল তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার লৌকিক জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। তপস্যার ত কথাই নাই, তাঁহার সমস্ত জীবনই উৎকট তপস্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার যে সকল লোকোত্তর বিভূতি আজকাল সকলকে চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্থূলতত্ত্বের অতীত একটি বিরাট্ শক্তির সত্তা প্রতিপাদন করিতেছে, ব্রহ্মচর্য্যের অবসান-কাল হইতেই সেই সকল সিদ্ধির স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। দণ্ডী ও সন্ন্যাসী অবস্থাতে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির বিশিষ্ট বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে নানালোকের নানা ধারণা আছে। এতদ্‌বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য যথাস্থানে বিস্তার-পূর্ব্বক বলা হইবে। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাত্র দুই একটি কথা বলা হইতেছে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ না হইলে প্রকৃত যোগবিভূতি প্রকাশিত হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রে' 'সর্ব্বাত্মভাব'কে মহাবিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য উহার বার্ত্তিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পুরুষ

ধাবমান হইলে ছায়া যেমন তাহার অনুসরণ করে, তদ্রূপ আত্মা বা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে ঐশ্বর্য্য স্বভাবতঃই প্রকটিত হয় —আত্মা হইতে ঐশ্বর্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় বিন্দুর শোধন ও স্থিরতা সম্পাদিত হয়,—উহাই জীবদেহের সত্ত্ব। উহা শুদ্ধ ও স্থির হইলে, অর্থাৎ সাধনবলে দেহ শুদ্ধ হইলে— ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি অধিকৃত হইলে—সিদ্ধি সকল আপনিই উপস্থিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

ভোলানাথ এই অবস্থায় যোগিজনবাঞ্ছিত অতীব দুর্লভ ও দুষ্কর নাভি-ধৌতি ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ও কঠোর নিয়ম পালন করিয়া বহুপ্রকারে ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াও অনেকে নাভি-ধৌতির অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগমার্গে এই ক্রিয়ার স্থান কত উচ্চ। বলিতে গেলে, যোগের ইহাই একপ্রকার শেষ ক্রিয়া। শুনিতে পাই একদিন তিনি নাভি-ধৌতি ও কিরাত-ধৌতি শিক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা গুরুগম্য—শুধু নিজের চেষ্টাতে এবং অল্প দিনের মধ্যে আয়ত্ত হইবার নহে। তিনি নাভি-ধৌতি ক্রিয়া শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া যোগাশ্রমস্থ একজন যোগী তাঁহাকে বলিলেন,—"ভোলানাথ, তুমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাও। আমরা সুদীর্ঘকাল,—এমন কি, শত বর্ষের অধিক সময় পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও যে দুর্লভ ক্রিয়ারত্ন লাভ করিতে পারিলাম না, তুমি বালক হইয়া এই অল্প বয়সেই তাহা অধিকার করিতে ইচ্ছা কর। তোমার ধৃষ্টতা ও

কম নহে।” ভোলানাথ বলিলেন,—“আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু জগতে এমন শক্তিশালী পুরুষ কি নাই, যিনি আপন ক্ষমতা-বলে উহা আমাকে এই বয়সেই শিক্ষা দিয়া ও তদনুরূপ যোগ্যতা উৎপাদন করিয়া দিতে পারেন?” যোগিবর ইহা শুনিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার পরিহাস করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ তাঁহাকে বলিলেন,—“আপনার ধারণা সত্য নহে। আমার হৃদয়ের একান্ত বিশ্বাস, দাদাগুরুদেব (অর্থাৎ ভৃগুরাম পরমহংস মহাশয়) ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন।” যোগিবর একজন অতি-দীর্ঘজীবী, প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ক্ষমতাশালী পুরুষ। তারপর তিনি একটি বৃহৎ মঠের অধ্যক্ষ। সুতরাং একজন অল্পবয়স্ক যুবক যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইয়াছে ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভোলানাথকে বিদ্রূপ ও ভৎসনা করিয়া দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। ভোলানাথ মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বয়ং শ্রীযুক্ত ভৃগুরাম স্বামী মহাশয় শূন্যমার্গে * সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোলানাথকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। ভোলানাথকে মর্ম্মপীড়িত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া একটু উগ্রভাব ধারণ পূর্ব্বক উক্ত যোগিবরের

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভৃগুরাম পরমহংসদেব আকাশ-মার্গেই যাতায়াত করেন—তিনি কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না। স্থূল দেহ লইয়া সূর্য্যলোকে গমন করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান যুগে একমাত্র তাঁহারই আছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তাঁহার স্থূলদেহ আমাদের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক ও ষাট্‌কৌশিক দেহ নহে। ইহা 'সিদ্ধ দেহ'।

অন্যায় ব্যবহারের জন্য তীব্র দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন এবং তখনই ভোলানাথকে নাভি-ধৌতি ক্রিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিলেন। শত শত বর্ষ দুষ্কর তপস্যা ও নিয়ম পালন করিয়াও যে ক্রিয়ার অধিকার জন্মে না, আজ তিনি নিমেষের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে একজন নবীন যুবককে তাহা দান করিলেন। শক্তিশালী যোগীর ক্ষমতার সীমা নাই। তখন হইতে কিছুদিন নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করিয়া ভোলানাথ নাভি-ধৌতিতে পূর্ণতা লাভ করেন।

কিরাত-ধৌতি নাভি-ধৌতিরই উন্নত অবস্থা বিশেষ। একটি মখমল বা অন্য কোন প্রকার শুদ্ধ বস্ত্রের ২৫।৩০ হাত দীর্ঘ খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে নাভি হইতে মুখ পর্য্যন্ত যথাবিধি অনুলোম ও বিলোম প্রণালীতে পুনঃপুনঃ চালনা করিতে হয়। এই ধৌতি-কার্য্যে ভাল অভ্যাস না থাকিলে "চাত্বর" বা আকাশ গমনের ক্ষমতা পূর্ণ হয় না। দীর্ঘকালের চেষ্টাতে প্রচলিত কুম্ভকের দ্বারাও শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু উত্থিত অবস্থায় কথাবার্ত্তা বলা চলে না। এমন কি, কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে চলিবার কালে সময় সময় প্রতিকূল প্রবাহশীল বায়ুর আঘাত লাগিয়া পতনের ভয় জন্মে। নাভি-ধৌতিতে পরিপক্কতা লাভ করিলে দেহ শূন্যময়* হইয়া যায়—সমগ্র দেহকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিবার ক্ষমতার বিকাশ হয়। তখন একটি লোমকূপের দ্বারে একটি

* এইজন্যই "অমনস্ক" "যোগবীজ" প্রভৃতি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'যোগদেহ'কে 'আকাশ দেহ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতি-বৃহৎ পদার্থও প্রবেশ করাইতে পারা যায়। * শরীরের যে কোন অংশকে তখন নিজের ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিতে পারা যায়। কিরাত-ধৌতি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া উহার কোন অঙ্গে বায়ু পূর্ণ করিয়া রাখার নামই কিরাত-কুম্ভক। এই কুম্ভকের বলে শূন্যে উঠিলে কথা বলিতে কোন বাধা হয় না,

* দেহকে ইচ্ছাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারিলে অণিমা মহিমাদি সিদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বাবাজীর দেহে প্রায় তিন চারিশত স্ফটিকশিলার গোলক (Crystal balls) নিহিত আছে। মস্তকের অভ্যন্তরে বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, বৃহৎ স্ফটিকের মালা প্রভৃতি সাজানো আছে। প্রয়োজন হইলে তাহা বাহির করেন ও পরে ঢুকাইয়া রাখেন। অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। জপের মালা শিরোহভ্যন্তরে রাখিবার নিয়ম শাস্ত্র-মুখে অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখিবার অবসর সকলের হয় না। তাঁহাকে বড় বড় স্ফটিকের গোলক লোমকূপ দিয়া ঢুকাইতে ও বাহির করিতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। ঐগুলি এক অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া অন্য অঙ্গে সঞ্চালিত করিতেও দেখিয়াছি। কখনও কখনও সঙ্কোচ-প্রসারের ফলে দুই-একটি স্ফটিক-খণ্ড দেহ হইতে আপনিই ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। দেহ-মধ্য হইতে নির্গত স্ফটিকাদিতে অতি উগ্র ও বিশুদ্ধ পদ্ম-গন্ধ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। তীব্ররূপে যোগ ক্রিয়া করিলে দেহাভ্যন্তরে যে ভয়ানক তাপ ও অত্যুগ্র তড়িৎশক্তির বিকাশ হয়, উহাকে শান্ত করিয়া সাম্যভাবে আনিতে হইলে শীতস্পর্শ স্ফটিকখণ্ড দেহে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয়। কিরাত-যোগের অভ্যাস না থাকিলে ইহা পারা যায় না। এই বিষয়ে যাহা যাহা আমি নিজে বুঝিয়াছি ও তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, তাহা পরবর্ত্তী ভাগে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করা হইবে। বর্ত্তমান স্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

এমন কি, কথা বলিতে বলিতেও উঠা যায়। বাহ্যজ্ঞান থাকে অথচ বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা জন্মে। নাসিকাদি দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে সাধারণতঃ তাহা হয় না। পরকায়া-প্রবেশাদির পক্ষে ও সাধারণ কুম্ভক অপেক্ষা কিরাত-কুম্ভক অধিকতর উপযোগী। কিরাত-কুম্ভকের দ্বারা যখন দেহে বিশুদ্ধ বায়ু ভরিয়া লওয়া যায়, তখন কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। অতি প্রবল ও শক্তিশালী তেজোরাশির দর্শন ও সংস্পর্শেও তখন জ্ঞান নষ্ট হয় না।

যখন ভোলানাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন কখনও কখনও বর্দ্ধমানে আসিয়া স্বীয় জননীকে দর্শন দিয়া যাইতেন। এমন মাতৃভক্ত, মাতার একনিষ্ঠ সেবক, খুব অল্পই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যাহাতে মাতার মনঃকষ্ট হইবার সুদূর সম্ভাবনা আছে এমন কাজ তিনি কখনও করিতেন না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমানে থাকিয়া ডাক্তারি ব্যবসায় করিতেন। তিনি ভোলানাথকে খুবই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার অলৌকিক তপঃশক্তিবশতঃ সম্পর্কে কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতেন। ভোলানাথও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত হইতেন না। একবার ভূতনাথবাবু ছোট ভাইকে ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"ভোলানাথ, শুনিয়াছি তুমি সাধন-বলে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। আমার একটি চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যদি তুমি নিজের তপঃপ্রভাবে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি নিজের

জীবন ধন্য মনে করিব। আমার অনুরোধটি অপর কিছু নহে—আমি আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি, জীব নিত্য—আত্মা অবিনশ্বর, যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন হয়, সে শুধু রূপের। কিন্তু যোগী যোগবলে অতীত ও অনাগত রূপকেও সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমার এই সাধটি মিটাইতে পার।”

ভোলানাথ বলিলেন,—“দাদা, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। যোগ অথবা বিজ্ঞান-বলে না হইতে পারে এমন কোন কার্য্য নাই। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের সমরাবসানে শোকাতুরা গান্ধারীকে পরলোকগত আত্মীয় স্বজনকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। যোগীমাত্রই ইচ্ছা করিলে তাহা পারেন। আর যিনি বিজ্ঞানবিৎ, প্রাকৃতিক রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ, তিনি বিজ্ঞানবলেও উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দাদা, দেখিয়া ফল কি? জানিয়া রাখুন, সকলেই অমর (মৃত্যু শুধু বেশ-পরিবর্ত্তন মাত্র)। যে রূপ একবার এ জগতে দেখিয়াছিলেন আবার সেই রূপ যদি ক্ষণেকের জন্যও দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনি ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিবেন না। তদপেক্ষা মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা স্থিরভাবে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করাই ভাল।” কিন্তু ভূতনাথ বাবু তাহা মানিলেন না, তিনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ জানিতেন যে, বিশেষ আত্মসংযম না থাকিলে পরলোকগত প্রিয়জনকে দেখিবামাত্রই মানুষ উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে। তাই তিনি যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, দাদার সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব, তখন সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন তাঁহার আদেশ অনুসারে একটি গৃহ সজ্জিত করা হইল—তন্মধ্যে একটি শয্যা প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে স্বর্গীয় পিতৃদেবের মূর্ত্তি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় পরিচিত বেশে ঐ শয্যার উপর আবির্ভূত হইলেন—প্রশ্নের যথা প্রয়োজন উত্তর দিলেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিয়া মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ভূতনাথবাবু অকস্মাৎ পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আরও একবার তিনি এই প্রকার পর্য্যটন-ব্যপদেশে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। সেবার ভূতনাথবাবু সাংঘাতিকরূপে পীড়িত ছিলেন—নানাপ্রকার চিকিৎসা দ্বারাও কোন উপকার হয় নাই। ভোলানাথ দাদাকে এই কঠিন পীড়া হইতে নিজের অসাধারণ তপোবলে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধার করেন ও যাওয়ার সময় তাঁহাকে একটি কবচ দিয়া যান। আনুষঙ্গিক নিয়মের মধ্যে পিঁয়াজ ও ডিম খাইতে নিষেধ করেন। বৌদিদিকেও সেবিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু ভূতনাথবাবু কোনও নিয়ম মানিয়া চলিবার লোক ছিলেন না। দৈবদুর্ব্বিপাকে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুনরায় নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সন্তানের আসন্ন ঘোর বিপৎ লক্ষ্য করিয়া মায়ের প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। ভোলানাথ তখন বহু দূর দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, দৈশিক ব্যবধান সত্ত্বেও প্রাণের সহিত প্রাণের যোগসূত্র যাইবে কোথায় ? জননীর হৃদয়বেদনা অন্তর্দ্দর্শী মহাপুরুষ সুদূর হইতেই প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া

তড়িদ্‌বেগে বগুল গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"মা, দাদা আর বাঁচিবেন না, তাঁহার অন্তিমকাল সমাগত হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে তাঁহার শেষ অবস্থা দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন, তারিখ ও সময় ঠিক ঠিক নিরূপণ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ভূতনাথবাবু ঠিক সেই সময়েই মানবলীলা সংবরণ করেন। মা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া পড়িলে মাতৃগতপ্রাণ পুত্র তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহার শোক নিবৃত্ত করেন ও নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করান। এই প্রকারে মাতার ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ২।৩ দিন পরে তিনি চলিয়া যান।

যখন ভূতনাথবাবুর কন্যার বিবাহ হয়, তখন তিনি কোন মত প্রকাশ করেন নাই। আত্মীয় স্বজনগণ সমস্ত আয়োজন করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে তিনি আপন মাতার নিকট ভবিষ্যচিত্র স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—"বিবাহের কিছুদিন পরেই বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী।" কার্য্যেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসাশ্রমের অবসানে পরমারাধ্য গুরুদেবের আদেশে ভোলানাথ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে উদ্যত হইলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা অবলম্বনে প্রকাশিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিলেন। যিনি কঠোর সাধনা করিয়া দুর্লভ সিদ্ধিরত্ন সকল আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি মনোবৃত্তির উদয়াস্ত ও তাহার হেতু সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করিয়া নিজের বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনধীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন পূর্ব্বক মর্ম্মগ্রহণ করিতে কালবিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? গুরুদেবের অনুগ্রহে, স্বকীয় প্রতিভার উন্মেষে, যথোচিত পৌরুষের প্রভাবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তিনি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গুস্করা নামক একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ্ লাইন এই গ্রাম ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—গুস্করা নামে উক্ত লাইনের একটি ষ্টেশনও আছে। তখন এই গ্রামে চোঙ্গদার বংশ সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। এই পরিবারের হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার মহাশয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা তখন চারিদিকে সকলেই জানিত। ভোলানাথ চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার জন্য গুস্করা গ্রামে গমন করেন এবং উক্ত চোঙ্গদার মহাশয়দিগের কাছারী-

বাড়ীতে নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। চোঙ্গদার পরিবারের সহিত বগুলের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেক দিন হইতেই আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই গ্রামে থাকিয়া লোকলোচনের সমক্ষে অথচ অন্তরালে, অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে, নিষ্ঠা, নিয়ম, সদাচার, সংযম ও ব্রাহ্মণ্যভাবের সংরক্ষণপূর্ব্বক তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সহসা কাহারও নিকট ধরা দিতেন না। সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তবে কমলে মধু সঞ্চিত হইলে মধুকরকে আহ্বান করিতে হয় না, সে আপনিই আপন রসপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, গুঞ্জনধ্বনিপূর্ব্বক কমলের গুণগান করিয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। সহস্র প্রকারে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভোলানাথের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দূরদূরান্তর হইতে অসংখ্য লোক নিরন্তর তাঁহার দর্শন ও কৃপা-প্রত্যাশী হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার লোকোত্তর সিদ্ধির কথা দেশে-বিদেশে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

তিনি চিকিৎসা করিতেন বলিয়া গুস্করাতে 'ডাক্তারবাবু' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি পাশ্চাত্য প্রণালীতেই চিকিৎসা করিতেন, তথাপি তাঁহার কিছু বিশিষ্টতা ছিল। প্রথমতঃ, তিনি যোগ-জ্যোতিষের দ্বারা রোগীর যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। যদি বুঝিতে পারিতেন রোগ অসাধ্য, অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে তিনি সে রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিতেন না।

যে রোগীর চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করিতেন, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু যাহার চিকিৎসা করিতে তিনি সম্মত হইতেন না, সে বুঝিতে পারিত যে, তাহার রোগ প্রতীকার-সাধ্য নহে। ফলতঃ তাঁহার হাতে প্রায় কোনও রোগীরই মৃত্যু হইত না। কিছুদিন এই প্রকার চিকিৎসায় তাঁহার সুকীর্ত্তি এতদূর বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বহু দূরদেশ হইতে তাঁহার নিকট নিরন্তর নানাপ্রকার রোগীর সমাগম হইত। ইহাতে তাঁহার আর্থিক আয় কম হইত না। তিনি দরিদ্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাহাদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যাইয়া দেখিয়া আসিতেন। বহুস্থলে অবস্থানুসারে নিজহস্তে শুশ্রূষা করিতেন এবং অকাতরে নিজ ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

যোগ-জ্যোতিষ ও দেব-জ্যোতিষে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। যোগ-জ্যোতিষ অবলম্বনে কোষ্ঠী-নির্ম্মাণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশ বাবদ তিনি প্রতিমাস বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেন।

প্রচলিত জ্যোতিষ হইতে যোগ-জ্যোতিষের অনেকাংশে বৈলক্ষণ্য আছে। নানা কারণে সাধারণ জ্যোতিষের গণনা ভ্রান্তিসঙ্কুল হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম গণনা ত এক প্রকার হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু যোগ-জ্যোতিষ সেরূপ নহে। ইহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই এবং গণনার সূক্ষ্মতা কল্পনাতীত ভাবে যথেষ্টরূপে সম্পাদিত করিতে পারা যায়। যোগ-ক্রিয়ায় বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ হইলে নানাবিধ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনের বিক্ষিপ্ততা নিবৃত্ত হওয়ার দরুণ কল্পনা-প্রভাব একেবারে হীন

হইয়া পড়ে; ফলতঃ জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃতভাবে প্রকট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মনুষ্যের দেহাদির অভ্যন্তরে গ্রহসমষ্টির ব্যক্তিগত রূপ ও তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। স্থূলকথা—যোগরাজ্যে উন্নতি লাভ করিলে যোগাঙ্গ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বশতঃ জ্যোতিষ-তত্ত্বে যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যোগ-জ্যোতিষের ক্ষমতা অসাধারণ। কোন লোককে দেখিবামাত্র, এমন কি, না দেখিয়াও, তাহার জন্মমুহূর্ত্ত নির্ণয় করিয়া, জন্মকালীন গ্রহসংস্থান আবিষ্কার পূর্ব্বক, তাহার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করা যায়। যোগিগণ জন্ম বলিতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় গ্রহণ না করিয়া গর্ভাধানের মুহূর্ত্ত গ্রহণ করেন। কারণ যে-ক্ষণে পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরজঃ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সন্নিকর্ষ ঘটিত নিয়মানুসারে বিন্দুর উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণই যথার্থ জন্মক্ষণ। মাতৃগর্ভে সেই বিন্দু পুষ্টিলাভ করে মাত্র। যথোচিত পুষ্ট ও কাঠিন্য-সম্পন্ন হইয়া বাহ্য-জগতে আগমন করে। এই যৌগিক বিন্দুই শাস্ত্রে বীজ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির বীজ যে প্রণালীতে ভূমিতে বা ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া, প্রতিবন্ধক না থাকিলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয় ও যথাসময়ে ভূমির আবরণ ভেদ করিয়া বাহ্য আলোকের দিকে উত্থিত হয়, মাতৃগর্ভেও সেই প্রকার দেহবীজের ক্রম-পরিণাম সম্পাদিত হয়—পরে কাল পূর্ণ হইলে উহা বাহিরে প্রকাশিত হয়। যোগিগণ কোন দেহ

দেখিবামাত্রই তাহার বীজটির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বীজ জানিতে পারিলে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক শক্তি-নিচয়ের সন্ধান পাইলে তাহার ভবিষ্যৎ আকার জানিতে কোন বাধা থাকে না। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন heredity ও environment দ্বারা প্রাণিদেহের ও চিত্তের বিকাশ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, নিদানাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেরূপ সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট কারণের দ্বারা, অর্থাৎ predisposing ও exciting cause-এর আলোচনা করিয়া, রোগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, নৈয়ায়িকগণ যে প্রকার উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ-মালার বিচার করিয়া কার্য্যোৎপত্তির দার্শনিক উপপত্তি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যোগিগণও দেহবীজের উপর অভিব্যক্ত জগতের ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির প্রভাব বিবেচনা করিয়া ঐ বীজের ক্রমবিকাশ ধরিয়া থাকেন। *

বাবাজীর সহিত যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত আছেন, তাঁহারা সকলেই যোগ-জ্যোতিষের অদ্ভুত ব্যাপার নানা ভাবে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার পুরাতন শিষ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যখন প্রথম বাবাজীর সঙ্গ লাভ করেন, তখনকার একদিনের কথা এইখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ণনাটি উপেন্দ্রবাবু স্বয়ং যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন— "একদিন বর্দ্ধমান হইতে ফিরিবার সময় আমি ও আমার অধী[illegible]

* 'এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় ভাগে থাকিবে।

একটি কর্ম্মচারী (শ্রীযুক্ত বামাপদ বিশ্বাস) তাঁহার (অর্থাৎ বাবাজীর) শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য গুস্করা কাছারী বাড়ীতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, ঘরের কোণে একখানা সাধারণ কাষ্ঠাসনের উপর বাবাজী বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ সহাস্য-বদনে 'কি গো, কেমন আছ ?'—বলিয়া নিকটে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলাম। কথায় কথায় বলিলাম—'আপনি খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন। আমার কোষ্ঠীখানা কি একবার আনিব—দেখিয়া দিবেন ?" তিনি বলিলেন—'কেন গো, কোষ্ঠী আনিতে কেন হবে ? তোমার কোষ্ঠী আমার নিকটে আছে। তুমি যে আমার বহুদিনের পরিচিত।' আমি বলিলাম—'কই, দেখি।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার নোট-বহিতে আমার জন্ম-বার তিথি-নক্ষত্র সন-তারিখসহ গ্রহসংস্থান ঠিক করিয়া কুণ্ডলী তৈয়ার করিয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম—এ কি অপরূপ ব্যাপার! ইনি আমার কোষ্ঠী কোথায় পাইলেন ? এ জীবনে ত আমার সঙ্গে আর পূর্ব্বে দেখা হয় নাই—তবে ইহা কি ভাবে জানিতে পারিলেন ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'ভাবনা কি গো ? সবই হয়। জল খাও।' বলিয়া আমাকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও আম লিচু প্রভৃতি ফল দিয়া নিজ হাতে আহার করাইলেন।"

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চেল মহাশয় বাবাজীর সহিত প্রথম পরিচয়ের বর্ণনাসূত্রে যাহা লিখিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখও আবশ্যক মনে হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি তখন কলিকাতায় থিয়েটার রোডে অবস্থান করিতাম। বহুদিন

হইতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি আমার ততটা আকর্ষণ ছিল না। আমার ধারণা ছিল, যিনি যথাকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, যিনি আচারবান্ ও সংযমী, এমন ব্রাহ্মণ যদি ভাগ্যবলে কখনও প্রাপ্ত হই, তবে তিনিই আমার আদর্শ হইবেন। তখন একদিন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজন ভদ্রলোকের মুখে বাবাজীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিতে পাই। মণীন্দ্রবাবু বাবাজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ভোলানাথবাবু এমন অদ্ভুত লোক যে, তিনি একই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত বসিয়া তাস খেলেন ও চণ্ডীমণ্ডপে কর্ত্তাদের সঙ্গে গল্প করেন। এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা তিনি বলিয়াছিলেন। শুনিবামাত্রই আমার মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হইল। আমি মণীন্দ্রবাবুর নিকট ঠিকানা জানিয়া গুস্করায় একখানা জবাবী টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, আমি যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি—এখন যাইব কিনা কৃপা করিয়া জানাইবেন। যথাসময়ে উত্তর পাইলাম 'not now' (এখন নহে)। কিন্তু এই প্রকার নৈরাশ্যজনক উত্তর পাইয়াও আমি নিরাশ হইলাম না—প্রাণ টানিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ গুস্করায় রওনা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলাম—বাবাজী তখন ঘরে ক্রিয়াতে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহির হইলেন—গাত্রে পদ্ম-গন্ধ ভুরভুর করিতেছে, ঘর হইতে বিচিত্র সদ্‌গন্ধ নির্গত হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ—অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। আমি তখন এক পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। বাবাজী বলিলেন—'কি

গো, কখন এলে ?' আমি বলিলাম—'এইমাত্র এসেছি। আপনার নিষেধ-সত্ত্বেও না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না।' এই বলিয়া হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে আমার ও আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দুইখানা বাহির করিতে ইচ্ছা করিলাম। তিনি বলিলেন,—'ও কি ?' আমি উত্তর দিলাম। তিনি তখনই ঘরে যাইয়া একখানা খাতা লইয়া আসিলেন—দেখিলাম, তাহার মধ্যে একখানা পৃথক্ কাগজে আমার ও আমার স্ত্রী প্রভাবতী দাসীর নাম, জন্মকালাদি এবং ফলাফল সব লিখিত রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিলাম,—আমার নাম আপনি জানিলেন কিরূপে ? আমার স্ত্রীর নামই বা কি প্রকারে জানিলেন ? আমি যে এখানে আসিব, তাহাই বা জানিলেন কি প্রকারে ? উহা ত আমার নিজেরও নিশ্চয় ছিল না। এমন কি, 'তার' করার সময়েও জানিতাম না। জন্মশক প্রভৃতিই বা কি উপায়ে বাহির করিলেন ?' তিনি বলিলেন,—'তোমাকে এখন আসিতে বারণ করিয়াছিলাম। তা সত্ত্বেও যখন তুমি রওনা হইলে দেখিলাম, তখন তোমাদের কোষ্ঠী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলাম। এই দেখ, নিজের কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলাইয়া লও।' মিলাইলাম—সব মিলিল, শুধু জন্ম-মুহূর্ত্তের একটু সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার গণনাই ঠিক, আমার কোষ্ঠীর গণনা ভুল। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি আমার কোষ্ঠী-প্রদর্শিত লগ্ন ঠিক হইত, তাহা হইলে আমি একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ হইতাম। বলিলেন—'দেখ, ঐ সময়ে তোমার জন্ম হইলে আমিই তোমার নিকটে যাইতাম,

তুমি আমার নিকট আসিতে না। ঐ সময়ে মনুষ্যের জন্ম হইতে পারে না। ও একটি বিশিষ্ট ক্ষণ'।"

জ্যোতিষ ও চিকিৎসা ব্যতিরেকে স্বরোদয় প্রভৃতি বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। অবসর মত গুরুদেবের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহার প্রয়োগও তিনি করিতেন। আমরা সাধারণতঃ স্বরোদয়ের যে সকল গ্রন্থ দেখিয়া থাকি, তাহা হইতে বাবাজীর স্বরোদয়-বিদ্যার গভীরতা অনুমান করা যাইতে পারে না। স্বরোদয় শাস্ত্রের যে সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও রহস্যময় তত্ত্বের কথা মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে প্রসঙ্গতঃ শুনিতে পাই ও তাঁহার নিকটে সময় সময় ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শী গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোনও শাস্ত্রের রহস্য অবগত হওয়া যায় না।

এই প্রকার নানাভাবে তিনি প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু যিনি আজন্ম ত্যাগী, যিনি গৃহে থাকিয়াও অন্তঃসন্ন্যাসী, দুর্লভ ব্রহ্মপদ যাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাঁহার পক্ষে অর্থসঞ্চয় সম্ভবপর নহে। একদিকে তাঁহার যেমন অর্থসমাগম হইত, অন্যদিকে তেমনই অর্থব্যয়ও হইয়া যাইত। অতিথি-সৎকার, সাধু-সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণ, দীন ও বিপন্ন পরিবারের সাহায্য দান—নানা প্রকারে জলের স্রোতের মতন অর্থব্যয় হইত। তিনি আয় এবং ব্যয় উভয়েই সমদৃষ্টি রাখিয়া নিঃস্পৃহ অকিঞ্চ

সন্ন্যাসীর মত গৃহে থাকিয়াও গৃহহীনভাবে, কাষায়-বসন পরিধান না করিয়াও স্থিরবীর্য্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন।

গুস্করাতে অবস্থানকালেই তিনি দার-পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্বর্গীয়া জননী বংশরক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতে জেদ করিয়া ধরেন। দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে তপস্যা করিয়া আরণ্যক জীবনযাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। যদিও তখন তিনি দেশ ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া একস্থানে বাস করিতেছিলেন, তথাপি তিনি অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা তিনি চিরদিনই শিরোধার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। মাতার আদেশ পাইবামাত্রই তিনি গুরুদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় অভিপ্রায় যথাবৎ বিনম্রভাবে নিবেদন করিলেন। গুরুদেবও তাঁহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তাঁহার সতীর্থ ও সঙ্গী হরিপদবাবুও এই প্রকার গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। ফলে, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনবশতঃ তাঁহার তপস্যার প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। তিনি অনেকবার গুরুদেবের শ্রীচরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুদেব আদেশ প্রত্যাহার করিলেন না। বহুক্ষণ রোদনের পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হরিপদ, তোমার এ জন্ম নিষ্ফল হইল বটে, কিন্তু আগামী জন্ম ভাল হইবে।"

ভোলানাথও যে একেবারে আশঙ্কিত হন নাই তাহা নহে। তবে তিনি অসাধারণ গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন—গুরু মঙ্গলময়। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা, সবই শিষ্যের কল্যাণের জন্য। শিষ্য পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সময়ে তাহা বুঝিতে পারে। তবু তিনি একবার আপন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বিবাহের ফলে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটিবে কি না? উত্তর পাইয়াছিলেন—"তোমার তপঃপ্রভাব কোনকালে কম হইবে না। বরং উত্তরোত্তর তপস্যার তেজঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" গুরুদেবের এই স্নেহময় আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভোলানাথ বিবাহ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে শুভমুহূর্ত্তে বর্দ্ধমান জেলাতেই তাঁহার শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। গুরুর আদেশে সন্ন্যাসী আজ গৃহস্থ সাজিলেন—মাতার চিরপোষিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু বাহিরে গৃহস্থ হইলেও তিনি যেমন সন্ন্যাসী ছিলেন তখনও তেমনই থাকিলেন। যিনি অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী, তাঁহার পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন শুধু রঙ্গমঞ্চের অভিনয় মাত্র। দেবগণের কার্য্যসাধনের জন্য তাঁহাদিগের অনুরোধে শিব যেমন বিবাহ করিয়াছিলেন, আজ স্বর্গাদপি গরীয়সী গর্ভধারিণী জননীর অনুরোধে গুরুদেবের কোনও অচিন্ত্য মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বালব্রহ্মচারী ত্যাগী যুবক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের মহত্ত্ব, আদর্শ গৃহীজীবনের নিদর্শন দেখাইবার জন্য—দুঃখ-পঙ্কে নিমগ্ন জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মহনীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, আজ কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে যুবক

গুরুদত্ত 'বিশুদ্ধানন্দ' নাম ও 'তীর্থস্বামী' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। মঙ্গলময়ের সকল বিধানেই পরম মঙ্গল নিহিত থাকে। ইহাতেও যে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণের পরম কল্যাণ নিহিত ছিল, তাহা আজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাবাজীর জীবন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চালিত হইত। প্রতিদিন সকালবেলা ক্রিয়া হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে যাইয়া ভ্রমণ করিয়া আসিতেন, ঠিক দশটার সময় ভোজন করিতেন এবং তদনন্তর সমাগত ভক্তগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। প্রয়োজন হইলে রোগী দর্শন করিতে যাইতেন, নতুবা কখনও কখনও অপরাহ্নে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। সূর্য্যাস্ত হইলে আর কোথায়ও থাকিতেন না—আপন পূজাগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিতেন। তখন আর কোনও প্রকার লৌকিক ব্যবহারে কালক্ষেপ করিতেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় পূজা-গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পর পর্য্যন্ত গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া জগৎপ্রসূতি, কল্যাণময়ী আদ্যাশক্তির স্নেহশীতল অঙ্কে বিশ্রাম করিতেন। পরে আবার ঘর হইতে বহির্গত হইয়া যথাসময়ে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য গমন করিতেন। তখন তাঁহার দেহ পদ্ম-গন্ধে আমোদিত থাকিত। যে ঘরে বসিয়া সাধন করিতেন সে ঘরেও দিব্য কমল-গন্ধ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত। তাঁহার নিকটবর্ত্তী সমগ্র বায়ুমণ্ডলটি যেন ফুটন্ত কমলের অলৌকিক সুবাসে আচ্ছন্ন থাকিত।

তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহার এই সময়কার অবস্থা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যখন যাই, দেখি, প্রায় বালক-বালিকারা বাবাজীকে ঘেরিয়া আছে, আর তিনি নানা প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া তাহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। সদাই আনন্দ। আমার চক্ষে বোধ হইতে লাগিল, যেন গুস্করা আনন্দের হাট। ঘাটে, মাঠে, বাজারে, দোকানে যেন আনন্দের ছড়াছড়ি। তাঁহার থাকিবার ঘরে সর্ব্বদাই পদ্ম-গন্ধ বিরাজ করিতেছে,—যেন তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ও আপন আপন পুষ্পসম্ভারসহ ছয় ঋতু সেখানে সদা বিরাজমান। বাবার অঙ্গ যেন সাধনা করিয়া লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা নিটোল করিয়া গড়িয়াছিলেন। কোন কোন দিন দেখিতাম, তিনি রাত্রে দুই তিনবার ও দিনে দুই তিনবার স্নান করিতেন। দারুণ শীতের মধ্যে গভীর রাত্রিতে হাতে লণ্ঠন লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তিনি পুষ্করিণীর জলে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ডুবিয়া থাকিতেন—আমি শীতে জড়সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম। পরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিতেন—বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। আবার সাধনার ঘরে কবাট বন্ধ করিতেন, বাড়ী সুগন্ধে মাতিয়া উঠিত। আমি দ্বারের নিকটে তক্তাপোষে বসিয়া থাকিতাম। প্রাতঃকাল সাতটা বা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সঙ্গে প্রায় দেখা হইত না। কোন অজানা দেশে, কোন অজানা লোকের রসে মজিয়া অজানা প্রেমে বিভোর হইয়া প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের রাজার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। প্রাতে যখন ঘরের কবাট খুলিয়া বাহির হইতেন, তখন মনে হইত, যেন হৃদয়ের

কবাটও খুলিয়া গিয়াছে, যেন বালকভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ঢুলু-ঢুলু, গাত্রময় গন্ধে ভরা, যেন তখনও আবেগের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, যেন তখনও প্রাণ হইতে প্রাণময় সরিয়া যান নাই, পা তখনও চলিতে চায় না, মুখ ফুটিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—যেন এতক্ষণ প্রাণ প্রাণে, মন মনে, হাত হাতে, পা পায়ে, চক্ষু রূপসাগরে ডুবিয়া মিশিয়া গিয়াছিল—এই বাহ্যজগতের সহিত তাহারা সকলেই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রাণপতি বিশ্বনাথের সেবায় নিযুক্ত ছিল। শিক্ষা দিতেন—এমনি ভাবে দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত আরাধনা করিতে না পারিলে ভগবৎ-প্রেমে প্রেমিক হওয়া যায় না,—পুরুষের সহিত প্রকৃতির, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার, ভগবানের সহিত ভক্তের, মিলন হইতে পারে না, জীবভাব শিবভাবে পরিণতি লাভ করে না।

"বাহিরে আসিয়া বসিতেন, কেহ পাখা লইয়া বাতাস করিত, কেহ বা পাদ-সংবাহন করিত। তখনও নেশার ঘোর কাটে নাই, তখনও মন যেন অজানা রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া আসে নাই। প্রায় দেখিতাম—বাহ্যভাবে আসিতে এবং কথা কহিতে বহু বিলম্ব হইত;

"তখন কাছারীর বারান্দায় রোগী, সাধু, গৃহী, বালক, বৃদ্ধ, ভোগী, যোগীর সম্মিলন হইয়াছে। সকলের মনঃ ও চক্ষুঃ সেই এক মহাপুরুষের উপর পতিত। তখন মধুরকণ্ঠে সকলের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'কি গো, কেমন আছ সব?'

"যেন কল্পতরু, সংসার-তাপে ঝালাপালা হইয়া কল্পতরুর

ছায়ায় বসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বদ্ধ জীব, বিষয়াসক্ত জীব, তাঁহার নিকট আসিত। কেহ 'ঔষধ দাও', কেহ 'বাবা, আমার গতি কি হবে', কেহ বা পুত্রশোকে কাতর হইয়া, 'বাবা, আমাকে শান্তির উপায় বলে দাও', বলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিত। কেহ কাপড় চাহিত, কেহ আবার বাবাজীর সহিত নির্জ্জনে সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। কোন কোন লোক হাতে ফল-ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, বালক-বালিকারা প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত। যে যাহা চাহিত তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া শান্ত করিতেন।

"সকলে বিদায় হইলে একটি হাত-কাটা জামা পরিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন —আসিয়া পূর্ব্বদ্বারী ঘরের কোণে নিজের কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। মধ্যাহ্নে ভোজনোত্তর নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। শাস্ত্রের গূঢ় ও জটিল রহস্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। বেলা একটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত গুস্করা গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রতিবেশী আসিতেন—যাহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিত, জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে সময় কাটিত। আবার সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিবামাত্রই সায়ংকৃত্য সমাধান করিবার জন্য পূজা ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন।"

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইত। কিন্তু তাঁহার নিয়মভঙ্গ হইত না। তিনি কঠোর অধ্যবসায়শীল ছিলেন—কিছুতেই হতোদ্যম হইতেন না।

গুষ্করাতে বাবাজীর গৃহে একটি বিষধর সর্প থাকিত। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন শরীর ভীষণ ভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্পটিকে দেহে জড়াইয়া রাখিতেন। সর্পের শরীর অত্যন্ত শীতল—উহার স্পর্শে দেহ বেশ স্নিগ্ধ থাকিত। বাবাজী আদর করিয়া ইহাকে 'শিবদাস' বলিয়া ডাকিতেন। ইহা কখনই কাহারও অনিষ্ট করিত না। তবে ঘরে কোন লোক গেলে ফোঁস করিয়া উঠিত ও ভয় দেখাইত, কিন্তু দংশন করিত না। বাবাজীর অনুপস্থিতিতে একবার একজন নূতন সেবক ঘর পরিষ্কার করিতে গিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই যে, ঘরে সাপ আছে। অপরিচিত লোকের শব্দ শুনিবামাত্রই সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠে। লোকটি দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে বাবাজী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করেন। এরূপ ঘটনা কখনও কখনও ঘটিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একবার তাঁহার বিশ্বনাথ দর্শন করিবার জন্য মন উচাটন হয়। সকলকে বলিলেন—'বিশে ক্ষেপাকে দেখ্‌তে মন টান্‌ছে। চল একবার কাশী হইয়া আসি।' শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়—যাঁহাকে ভোলানাথ 'শ্বশুর' বলিয়া ডাকিতেন এবং যিনি ভোলানাথকে 'জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বাবাজী সম্মত ছিলেন না। তবে তাঁহার পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মোদক প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা ৺কাশীধামে যথাসময়ে উপস্থিত হন। সেই সময় এলাহাবাদে কি একটা যোগ ছিল। সেখানে যাইবার জন্য বাবাজী মহাশয় প্রস্তাব করেন। তখন হঠাৎ চোঙ্গদার মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাপমান ১০৬° পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এলাহাবাদে যাওয়ার আশা আপাততঃ সকলকেই ত্যাগ করিতে হইল। বাবাজী তখনও আসন হইতে উত্থিত হন নাই। তিনি জ্বরের বিষয় কিছুই জানিতেন না। তিনি উঠিলেই সকলে নিরাশ মনে বলিতে লাগিলেন—'প্রয়াগ যাওয়া বোধ হয় এবার হল না!' শুনিয়া বাবাজী বলিলেন—'তা কেন হবে না? যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা অবশ্যই করিব!' তখন তিনি নিজের পা দুখানি ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"আমি এই পা ছড়াইয়া দিলাম, যজ্ঞেশ্বরের মাথাটি আমার দুই পায়ের মধ্যস্থলে ধরিয়া রাখ।"

তাহাই করা হইল। প্রায় ১৫ মিনিট রাখিতেই জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল, শরীর শীতল হইল। যজ্ঞেশ্বরবাবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা অনেকটা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে প্রয়াগধামে যাইয়া ত্রিবেণী স্নান ও আনন্দোৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন।

গুস্করায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু বাবাজীর পদসেবা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগৎ মিথ্যা, এ কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা কি ঠিক ?" বাবাজী বলিলেন—"কেহ কেহ জগৎকে মিথ্যা দেখে, কিন্তু যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, প্রজ্ঞা-চক্ষু ফুটিয়াছে, তিনি দেখেন, ঈশ্বরই সব হইয়াছেন।"

উ।—আমাদের জ্ঞান হয় নাই। আমরা যাহা দেখি তাহার কি অস্তিত্ব নাই ? তবে কেমন করিয়া জগতের সব দ্রব্যই চোখের উপর ভাসিতেছে ? কিছু না থাকিলে কি কিছুর উদয় হয় ?

বা।—ভ্রমবশতঃ অসত্যে সত্য প্রতীতি হয়। জ্ঞানে যাহা নাই, অজ্ঞানে তাহা থাকার মত দেখায়। ঐ যে জবাপুষ্প দেখিতেছ উহা তোমার চক্ষে জবা, কিন্তু বাস্তবিক কি উহা জবা ?

উ।—কেন বাবা ? এখনি তুলিয়া আনিয়া আমি আপনাকে দি। দেখুন, উহা জবা কি না।

বাবাজী কিঞ্চিৎ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন। "আচ্ছা, উপেন্দ্র, তোমার জবাফুল নিয়া এস।"

উপেন্দ্রবাবু উঠিয়া জবা গাছের নিকট গেলেন। ফুল তুলিয়া দেখিলেন উহা জবা নহে, গোলাপ ফুল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন—ছিল জবা, গোলাপ কি প্রকারে হইল ? গাছটা তবে কি ? দেখিলেন, গোলাপ গাছ। তিনি নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তদবধি গাছটি গোলাপ গাছই রহিল। বাবাজী বলিলেন—"তোমার চক্ষে যে রঙ্গ আছে, তাহাই দেখিতেছ। ইহা গুণ-বৈষম্যের ফল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ মিশ্রগুণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিতেছে। মানসিক বৃত্তিসমূহ চিত্ত-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে মায়িক জীবের চক্ষের উপর কর্ম্মরূপে বাহিরে প্রকাশ হইয়া কাহারও আনন্দ-দায়ক, কাহারও অতৃপ্তিকর হইতেছে। ইহাই গুণ-বৈষম্য।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই যে আপনি রহিয়াছেন, ইহাও কি মিথ্যা ?"

বলিতে বলিতে "আমার অস্তিত্ব কোথায় ?" বলিয়া বাবাজী অদৃশ্য হইলেন। উপেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা হইয়া আবার আসিয়া বসিলেন। উপেন্দ্রবাবুকে তামাক সাজিতে বলিলেন—"বাবা, এক ব্রহ্মই সত্য। ঠিক ঠিক কাজ করিয়া যাও। সবই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।"

কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বদ্বারী দরজার কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও উপেন্দ্রবাবুকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। তিনি ঘরে গেলে বসিতে বলিলেন। একটু পরেই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইলেন।

পৃথিবীর গতি ও যে শক্তিতে জগতের সমস্ত দ্রব্যকে ঘুরাইতেছে—একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এই অস্থিরের মধ্যে স্থির বস্তু কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়,—বোধ করিতে হয়—ও স্থিরের ভিতর চঞ্চলা প্রকৃতি কি গতিতে কর্ম্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চালাইতেছেন, জড় চৈতন্যের সহবাসে কেমন করিয়া কার্য্য করে, ইহা ভাল করিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন।

উপেন্দ্রবাবু দেখিয়া অবাক্। তিনি এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মাথার ভিতরে ধরিয়া রাখিতে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নদীর খরতর স্রোতের ন্যায় শত শত বাধা-বিঘ্ন সেই ভাবকে তাড়াইবার জন্য তীরবেগে আসিতে লাগিল। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা, বিনা সাধনায় কি উহা আটক করিতে পারিবে? যাহা কঠোর তপস্যার ফল, তাহা কি সহজে ধরিয়া রাখা যায়? চিত্ত নির্ম্মল কর। উহা আপনিই আসিবে। অসদ্‌বৃত্তি এখন যেমন সরিতে চায় না, সদ্‌বৃত্তিও চিত্ত নির্ম্মল হইলে তেমনই সরিবে না। চিত্ত-বিকার নিম্নে ও নির্ম্মল-চিত্ত উর্দ্ধে লইয়া যায়। তুমি যাহাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল রাখিতে পার তাহার চেষ্টা করিতে থাক।"

গুষ্করার উত্তর-পশ্চিমে কুনুর নদীর ধারে একটি বটতলাতে একবার একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি কখনও আপন আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। লোকে সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য দিয়া যাইত। কিন্তু তিনি কিছু খাইতেন না। তিনি মৌনী ছিলেন, সাধারণতঃ

কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না। বাবাজী মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন। শুনিয়াছি যে, তিনি বাবাজীর সতীর্থ ও সূর্য্য-বিজ্ঞানাচার্য্য পরমহংস শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ স্বামী মহাশয়ের শিষ্য ধবলানন্দ স্বামী। একদিন রাত্রে গুষ্করা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মোদক ও ৺কালিদাস ঘটক মহাশয়দ্বয় বাবাজীকে সঙ্গে লইয়া পেঁপে, দুধ প্রভৃতি সহ সন্ন্যাসীটিকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন। গুষ্করা হইতে ঐ বটতলাতে যাইতে হইলে একটি পুল পার হইয়া যাইতে হয়। পুল হইতে ঐ বৃক্ষমূল প্রায় পাঁচ শত হাত দূরবর্ত্তী ছিল। পুলের উপর হইতে বৃক্ষমূলে অবলোকন করিতেই দেখা গেল যে, বৃক্ষমূলে একটি জ্যোতিঃ একবার জ্বলিতেছে ও একবার নিবিতেছে। তাহার মধ্যে অবয়বাদি কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহাদের সঙ্গে একটি লণ্ঠন ছিল। হঠাৎ ঝট্‌কা বাতাস আসিয়া তাহা নিবিয়া গেল। বিনা আলোতে ঘোর অন্ধকারে যাইতে ভীত হইয়া কেদারবাবু বাবাজীকে ভয়ের কথা নিবেদন করিলেন। বাবাজী একটু হাসিয়া লণ্ঠনের দিকে একটু ফুৎকার করিবামাত্র লণ্ঠন আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন ক্রমশঃ ঐ সন্ন্যাসীর অঙ্গজ্যোতিঃ লুপ্ত হইল। সমীপে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া সন্ন্যাসী একটু অদ্ভুতভাবে হাস্য করিলেন। কেদারবাবু সমানীত ফলাদি সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীপ্রবর মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া বলিলেন—"যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য আছে তাবৎ নহে।"

একবার বর্ষার অবসান কালে ১৭।১৮ জন সঙ্গী লইয়া বাবাজী গুষ্করা হইতে ৺কামাখ্যাধাম গমন করিতে উদ্যত হন। যথাসময়ে কামাখ্যাধামে উপস্থিত হইয়া ও স্বকীয় আবাসস্থান স্থির করিয়া স্থানীয় পাণ্ডাবর্গকে কুমারীভোজনের জন্য কুমারী সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডাগণ এ বিষয়ে নিজেদের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, ৺কামাখ্যাধামে সাধারণতঃ বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া কুমারী ভোজন করান হয় না। যিনি কুমারী ভোজন করাইতে ইচ্ছা করেন তিনি দেবীর মন্দিরে বা তাদৃশ কোন স্থানে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পাণ্ডাদিগের এ সকল কথা শুনিয়া বাবাজী নিরুৎসাহ হইলেন না এবং নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি বাড়ীতেই কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন—তাঁহার আদেশে লুচী প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে আহার্য্যসম্ভার যথাবিধি সুসজ্জিত হইল, কিন্তু তখনও একটি কুমারীরও দর্শন নাই। ৺কালিদাস ঘটক, বিমলানন্দ প্রভৃতি বয়স্য-ভাবাপন্ন ভক্তগণ বাবাজীকে পরিহাসচ্ছলে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বাবাজী ধীরস্থির-গম্ভীরভাবে নিজের কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একটি কুমারী অকস্মাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিবামাত্রই ভক্তগণ সমাদর পূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়া দিলেন। কুমারী ভোজনান্তে যথাস্থানে চলিয়া গেল—পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও দক্ষিণা গ্রহণ করিল না। ইহার

পরে বাবাজী পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধ ও সংযত বেশে জগদম্বার মন্দিরে যাইয়া ক্রিয়াতে নিবিষ্ট হইলেন। দুই ঘণ্টা কাল মন্দিরে মায়ের আরাধনায় অতিবাহিত করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তখন তাঁহার কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, দেহ স্বেদ-বারিতে নিষিক্ত, মুখে মৃদু ও প্রশান্ত হাস্য,—তাঁহাকে দেখিবামাত্রই উৎকণ্ঠিত ভক্তগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন। বাবাজী গৃহে ফিরিতে ফিরিতে চারিদিক্ হইতে অবিশ্রান্ত-বেগে কুমারী আসিতে লাগিল। দীর্ঘকাল এই প্রকারে সমাগত কুমারীদিগের সৎকার সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভক্তগণ নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

একবার বাবাজী গুস্করা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন উপেন্দ্রবাবু পুলিশবিভাগে সব-ইন্সপেক্টরের কার্য্য করিতেন। সেই সময়ে সেখানকার পুলিশ সাহেব ছিলেন R. F. Guise. তিনি বড় দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। বাবাজী দুই একদিনের জন্য মাত্র সেখানে আসিয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবু তখন একজন উদ্যমশীল কর্ম্মী ভক্ত—তিনি বাবাজীকে যারপরনাই যত্নসহকারে সেবা করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে হঠাৎ একটি ত্রুটি হইয়া যায়। রাত্রে বাবাজীর পূজার ঘরে নৈবেদ্যাদির নিকটে ফুল রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাবাজী যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্রিয়া করিতে বসিয়া গিয়াছেন, তখন পূজাঘরের চারিদিকে অপূর্ব্ব ও মনোহর পদ্মগন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল। এই গন্ধ পাইয়া উপেন্দ্রবাবুর ফুলের কথা মনে পড়ে। তিনি সাজিতে করিয়া

ফুল আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলের কথা মনে পড়ায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আত্মগ্লানিতে মন অবসন্ন হইয়াছিল। প্রাতে আটটার সময় বাবাজী ঘরের কবাট খুলিলেন—কিন্তু লজ্জাবশতঃ উপেন্দ্রবাবু আজ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। পরে বাবাজী যখন স্নেহপূর্ণস্বরে তাঁহাকে ঘরে যাইতে বলিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অপরাধের মার্জ্জনা হইয়াছে। তিনি অমনি ঘরে গেলেন। যাইয়া দেখেন—শত শত পদ্ম পুষ্পে ঘর পরিপূর্ণ। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন পদ্মগন্ধের মধ্যে ভাসিতেছেন। তাহার উপর বাবাজীর গাত্র হইতে ভুরভুর করিয়া পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। বাবাজী বলিলেন—"স্নান-জল নাও। সকলকে দাও।" উপেন্দ্রবাবু সকলকে প্রসাদ ও স্নান-জল বিতরণ করিলেন। নিজেও গ্রহণ করিলেন। তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবাজী বলিলেন—"উপেন্দ্র, ফুল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

উপেন্দ্রবাবু—"হাঁ বাবা, আমার অপরাধ হইয়াছে। ক্ষমা করুন।"

বাবাজী—"ছেলের আবার বাবার নিকটে অপরাধ কি আছে রে, বাপু? উপেন্দ্র, তুমি আজ যে ফুল আনাইয়াছিলে সে ফুলে পূজা হইত না। নতুবা আমি নিজেই চাহিয়া লইতাম। বাপু, পূজা করিতে বসিয়া দেখি, একটি পুষ্করিণীতে বড় বড় সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; তাই মনে করিলাম, আজ ঐ ফুল দিয়াই মায়ের পূজা করিব। তোমার ভুল নহে।"- পরে

বলিলেন—"আজ তোমাকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইব। আচ্ছা, শুনিয়াছি তোমার সাহেব নাকি তোমার উপর বড়ই বিরক্ত। তোমার অনিষ্ট চিন্তা করে। দেখ, তুমি আজ তোমার প্রোমোশনের জন্য একটি দরখাস্ত লিখিয়া তাহার হাতে দাও ত।"

উপেন্দ্রবাবু—"বাবা, এমন কাজ কি করিয়া করিব? দরখাস্ত দিলে মারিতে আসিবে, আমি কাগজ লইয়া গেলে আমার মুখপানে তাকায় না। কাগজগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দি, আর কাজ শেষ হইলে চলিয়া আসি।"

বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, আজ না হয় আমার জন্য মার খাবে। দেখ না, কি হয়।" যথাসময়ে দরখাস্ত লিখিলেন, আপীসে যাইয়া কাগজ-পত্র ঠিক করিয়া লইলেন। দরখাস্তটিও সঙ্গে রাখিলেন। সাহেব ডাকিলেন, উপেন্দ্রবাবু নিকটে গেলেন, পাশে দাঁড়াইয়া এক এক করিয়া আপীসের কাগজ পেশ করিলেন। পরে 'জয় গুরু' বলিয়া দরখাস্তখানা সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। অন্য কাগজ দিবার সময় সাহেব নীচের দিকে মুখ করিয়াই প্রত্যেক কাগজে হুকুম দিতেন। কিন্তু দরখাস্তের কাগজখানা দিবার পরে কাগজখানা না দেখিয়াই তাঁহার দিকে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—দুইবার পড়িলেন। তাহার পর দরখাস্তের উপর লিখিতে আরম্ভ করিলেন—এক পৃষ্ঠা লিখিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন, বলিলেন—"তোমার ডবল প্রমোশনের জন্য আমি কলিকাতায় বড় সাহেবকে লিখিলাম। যদি না দেয়, আমি শীঘ্রই যখন নিজে

ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইব তখন সর্ব্বাগ্রে তোমাকে প্রমোশন দিব।" উপেন্দ্রবাবু কাগজ গুটাইয়া লইয়া আপীসে আসিলেন। বাসায় ফিরিয়া সমস্ত ঘটনা বাবাজীকে নিবেদন করিলেন। বাবাজী বলিলেন—"নারায়ণ কি অবিচার করেন, বাবা? তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই। তিনি যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। জীব তাঁহার মহিমা কি বুঝিবে? জীব যাহা যাহা ইচ্ছা করে সেই সকল পাইলে কি রক্ষা ছিল, বাবা? তিনি না দিলে পাইবার উপায় নাই। তিনি যে সব সময়ে সব জিনিষ দেন না ইহা তাঁহার মঙ্গল বিধান। অন্ধ জীব তমোগুণে কর্ত্তা সাজিয়া বিশ্বপতির কার্য্যকৌশল ভুলিয়া যায়। অহঙ্কারে বুদ্ধি কলুষিত করিয়া জীবের প্রজ্ঞা হরণ করে ও নশ্বর বিষয়-সুখ আস্বাদ করাইয়া করাইয়া তাহাকে কুপথগামী করে। সত্যের আদর চিরদিন। মিথ্যার প্রাধান্য সাময়িক হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বাবাজী স্বীয় সতীর্থগণের মধ্যে বয়সে ন্যূন হইলেও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকর্ষে অনেকেরই নমস্য হইয়াছিলেন। এ কথা সকলেই অকপটভাবে স্বীকার করিতেন। মহাত্মা ভৃগুরাম স্বামীর বিশিষ্ট কৃপাভাজন হওয়া সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা একদিন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"সবই ত জান। বেশ আছ। তোমার ন্যায় যথার্থ পুরুষেরই সংসারে থাকা কর্ত্তব্য। মহাত্মা মহাপুরুষ ভগবান্ পরমারাধ্য দাদাগুরুদেব শ্রীমদ্‌ভৃগুরাম পরমহংস দেব তোমার বিষয় কত যে বলিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তুমিই যথার্থ ভক্ত, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী, ত্যাগী ও গৃহী। অসীম সত্ত্বগুণ, অথচ ভোগী। দাদাগুরুদেব একদিন সকল যোগীকেই তোমার অসীম যোগের বিষয় দেখাইলেন। এখনও যে উগ্র তপস্যা করিতেছ তাহাও দেখাইলেন। ফিরে দেখি, কিছুই নাই—চকিতে অন্তর্হিত। দেহ কণ্টকিত হইল। পুনঃ দেখি, জগৎ নাই। এ কি খেলা ভাই? তাই জিজ্ঞাসা করি, জীবের অতীত বয়ঃক্রম হইল। অনেক ম্লেচ্ছ, হিন্দু, মুসলমান শিষ্য করিয়াছি। অনেক দেখিলাম, অনেক করিলাম। তোমার ন্যায় যোগশিক্ষা পরমারাধ্য ভৃগুরাম স্বামী আমায় দিলেন না। আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট কিছুদিন থাকিয়া চান্দ্র এবং যাগকল্প যোগ শিক্ষা করি? ইহাতে

অভিপ্রায় কি? জীবে শিবে পার্থক্য নাই, তবু মানে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে জীব যৌবনাবস্থাতে কাম-ক্রোধাদির অধীন হইয়া পাপ-পুণ্যাত্মক বিবিধ কর্ম্ম আচরণ করে। আহা, জীব দেহের ভোগার্থই কর্ম্মজাল আচরণ করে। দেহ আত্মা হইতে বিভিন্ন। আত্মা ত কিছুই ভোগ করেন না। যদি করেন, তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের ভাগী কে?"

বাবাজীর যোগমার্গে উন্নতি দেখিয়া ভৃগুরাম স্বামী সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহাকে একটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন 'হরিহর' নামক বাণলিঙ্গ উপহার দিয়াছিলেন। এই বাণলিঙ্গটি এত অধিক তেজোবিশিষ্ট যে, সিদ্ধ ব্রহ্মচারী ও শক্তিশালী যোগী ভিন্ন অপর কেহ ইহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। যোগমার্গে কে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই বাণলিঙ্গ দ্বারাই তাহার পরীক্ষা হইত। এই লিঙ্গটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দিনমানের বিভিন্ন সময়ে ইহাতে বিভিন্ন প্রকার বর্ণের বিকাশ হইত। শুধু তাহাই নহে—সাধক ইহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে ইহার মধ্যে কত যে অপূর্ব্ব ব্যাপার সকল দর্শন করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা সিদ্ধলিঙ্গ ছিল। সিদ্ধিলাভের সময় ইহা দীর্ঘকাল বাবাজীর মস্তকে রক্ষিত ছিল। পরে ইহা প্রত্যর্পণ করিবার সময় পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ইহা দান করিতে উদ্যত হন। তখন আশ্রমে একটি বিচিত্র কলরবের উদয় হয়। আশ্রমবাসী যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, এই লিঙ্গ আশ্রমের

সাধারণ সম্পত্তি—বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা যখন বহু সাধকের উপকার হইয়া থাকে, তখন ইহা আশ্রমেই রাখা উচিত, ব্যক্তিগত ভাবে একজনকে দান করা উচিত নহে। কিন্তু ভৃগুরাম স্বামী অতুল্য প্রতাপশালী—তিনি অন্যের মতামতে চালিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি একবার যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবেনই। তিনি সমবেত যোগিবৃন্দকে বলিলেন—"আমি বিশুদ্ধানন্দকে এই বাণলিঙ্গটি দিতেছি বলিয়া তোমাদের এত বৈমনস্য হইবার কারণ কি ? আমি ইহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়াই দিতেছি। যদিও এ বাণলিঙ্গ এখন হইতে আর এ আশ্রমে থাকিবে না বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের দুঃখিত হইবার কোন হেতু নাই। অদূর ভবিষ্যতে ইহা বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে স্থাপিত হইবে। তখন যাঁহার ইচ্ছা সেখানে যাইয়া ইহার পূজাদি করিতে সমর্থ হইবেন। যোগীর পক্ষে দৈশিক ব্যবধান অকিঞ্চিৎকর।" এই বলিয়া তিনি স্বকীয় গুরুদেবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে অভিবাদন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব, আমি আশ্রমের সিদ্ধ বাণলিঙ্গটিকে আজ কল্যাণভাজন বিশুদ্ধানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি জানি, একমাত্র সে-ই এই অসাধারণ বস্তু ধারণের যোগ্য পাত্র। আপনি আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ইহাতে সম্মতি দান করুন।" গুরুদেব হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ সহকারে সম্মতি দান করিলেন। বাবাজী এই বাণলিঙ্গটি প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবের আদেশক্রমে পুনরায় নিজের মস্তকাভ্যন্তরে স্থাপন

করিলেন। শুধু ক্রিয়া ও পূজার সময়ে মস্তক হইতে মুখাদি কোন দ্বার অবলম্বনপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইতেন। আবার ক্রিয়াবসানে উহাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। এই লিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন শিবলিঙ্গ তাঁহার ক্রিয়াকালীন প্রকাশমান তীব্র তেজোরাশি ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। সে প্রকার চেষ্টাও অনেকবার হইয়াছে। ক্রিয়ার সময়ে সাধারণ কোন লিঙ্গের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে গেলেই উহা ফাটিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী বাবাজীর জন্মস্থান বণ্ডুলগ্রামে ঐ বাণলিঙ্গটি স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য একটি মন্দির, আশ্রম ও গুহা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বাবাজীর ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল না। তিনি রেল লাইনের পার্শ্বে শক্তিগড় নামক স্থানে আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তবে গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তিনি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। এই লিঙ্গ স্থাপনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কিন্তু এস্থলে তাহা প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে সময়ও সমাগত হয় নাই। যথাসময়ে বণ্ডুল গ্রামে বণ্ডুলেশ্বর নামে এই শিব স্থাপিত হইলেন। মন্দির, গুহাদি যথাবিধি আদেশানুসারেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থানে মন্দির রচিত হইয়াছে, সেই স্থান খনন করিয়া ভূমধ্যে একটি প্রোথিত ত্রিশূল পাওয়া গিয়াছিল। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী পূর্ব্বেই এই বিষয়ে ইঙ্গিতে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বণ্ডুলেশ্বর স্থাপনের ফলে বণ্ডুল গ্রামের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বহু

কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বণ্ডুলেশ্বরের মহিমা অবর্ণনীয়। যিনি কর্ম্মী, তিনি কিছুক্ষণ তাঁহার নিকটে স্থিরভাবে বসিলেই তাঁহার অনুপম মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। যোগ ও মন্ত্র সাধনার পক্ষে এরূপ অনুকূল স্থান অতি-বিরল।

বণ্ডুলেশ্বর প্রতিষ্ঠার পর হইতে বণ্ডুলে প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় খুব সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হয়। দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমাগত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। শঙ্কর ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে ও নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আনন্দরসে অপূর্ব্বভাবে সময়টি কাটিয়া যায়। ভক্তগণের পরস্পরের মিলন জন্য অনির্ব্বচনীয় সুবিমল আনন্দ এই মঙ্গলোৎসবের অবসরটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখে।

গুষ্করাতেই বাবাজীর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এইখানে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজিত হইতেন। গৃহী, সন্ন্যাসী, রোগী, ভোগী ও যোগী—তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিত সেখানে এমন কোন লোকই ছিল না। এই স্থানে থাকিতে তাঁহার যে কত বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় না। কত উপলক্ষ্যে কত জনে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিন্তু পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিরুদ্ধভাবে আসিয়া বিরোধ ভুলিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে, জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সোপান প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবান্ মঙ্গলময়, তাই যদি কেহ তাঁহাকে শত্রুভাবেও আরাধনা করে, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গল হয়। তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত প্রকৃত

মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার সঙ্গগুণে অসাধু পুরুষও সাধুত্ব লাভ করে। কারণ, "মক্ষিকাও মরে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।" অচিন্ত্য বস্তুশক্তির মহিমা তর্ক ও বিচারের অতীত।

তীর্থস্বামী অবস্থার পরে বাবাজীর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন ও তাঁহাকে 'পরমহংস' উপাধিতে বিভূষিত করেন। আশ্রমের বিধান-মত তাঁহাকে পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল—পরীক্ষক ছিলেন স্বামী নীমানন্দ পরমহংস। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ শুধু মঠের নিয়ম পালন মাত্র। দুধ ও জল একত্র মিলিত থাকিলেও হংস যেমন তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দুধকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক সাধন পূর্ব্বক আত্মাভিনিবেশ পূর্ণ হইলেই যোগী হংসরূপে পরিগণিত হন। তারপর পরমাত্মার উপলব্ধি হইলে হংসভাবের উর্দ্ধে পরমহংস-ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। পরমহংস ভাব দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। এই অবস্থায় জাগতিক দ্বন্দ্বের উপশম ঘটে, নির্দ্বন্দ্ব অদ্বয় পদের প্রাপ্তি হয়। হংস অবস্থাতেই প্রকৃতির উপর স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। আত্মাভিমান একান্তভাবে বিগলিত হইলে ও জগৎস্বামীর সহিত নিজের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে—অর্থাৎ পরমহংসাবস্থা লাভ করিলে—প্রকৃতি বস্তুতঃই আয়ত্ত, এমন কি নিজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তখন অভিমান থাকে না—একটি শুদ্ধ বোধ মাত্র থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরমহংস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর পরে বাবাজী গুষ্করা ত্যাগ করেন ও বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ বাজারে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইখানে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে থাকিবার সময় একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। একজন লোক ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাবাজীর সন্ধ্যাগৃহে লুকাইয়া ছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, বাবাজী কি প্রকারে ক্রিয়া করেন তাহা স্বচক্ষে দেখা এবং ক্রিয়ার সময় কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে কিনা, তাহা জানিবার চেষ্টা করা। যিনি ঐ লোকটিকে এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে অধ্যাত্ম-জগতের ব্যাপার জানিতেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাবাজীকে পরীক্ষা করা ও তাঁহার সাধনা-প্রণালী অবগত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। বাবাজী গৃহমধ্যে বায়ুর ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হন। যখন বাহ্যবায়ু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা স্তম্ভিত করিতেছিলেন, তখন গৃহস্থিত বায়ুমণ্ডল স্তিমিত হইতেছিল। যে লোকটি গৃহের একপ্রান্তে অজ্ঞাতভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল, সে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বায়ু আকর্ষণের সময় শ্বাস-কষ্টে পীড়িত হইয়া 'বাবারে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারধ্বনি শুনিয়া বাবাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি লোকটিকে দেখিয়াই

অনুমানে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাকে না বলিয়া বায়ুর সাম্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাহার জীবন রক্ষা করিলেন, তাহাকে তাহার অপকার্য্যের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"দেখ, এই প্রকারে কোন যোগীকে পরীক্ষা করিতে যাইও না। গেলে ভয়ানক বিপদে পতিত হইবে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম বলিয়াই তুমি বাঁচিয়া গেলে। নতুবা বাঁচিবার কোনই আশা ছিল না। সময় বিশেষে দেহ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। যোগিগণ গুহ্যভাবে কখন্ কি কার্য্য করেন তাহা বাহ্য-জগতের পক্ষে জানিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি তুমি দুর্ব্বাসার ন্যায় প্রকৃতি-বিশিষ্ট যোগীর কোপভাজন হইতে, তাহা হইলে তোমার আজ সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। যাও, এইরূপ কার্য্য আর কখনও করিও না।"

আর একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। পূজার ঘরের দ্বার ভেজান ছিল—ক্রিয়াতে বসিবার পূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি বাহির হইলেন না। অন্যান্য দিন যে সময়ে বাহির হইয়া থাকেন সে সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও দ্বার খুলিল না। আশ্রমস্থিত ভক্তমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেহ মনে করিলেন, তিনি কোন গুরুতর কার্য্যে হয়ত ব্যাপৃত আছেন। কেহ ভাবিলেন, হয়ত তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে যোগপ্রভাবে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন—আসিতে বিলম্ব হইবে। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই ঘটিত। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনা-গৃহে আসনে বসিয়া গিয়াছেন—ভিতর হইতে দ্বার

অবরুদ্ধ রহিয়াছে। অথচ পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি দূরদেশে কোন স্থানে যাইয়া কোন ভক্তকে দর্শন বা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। কখনও কখনও একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত হইতেন। যোগীর গতিবিধির সন্ধান রাখিবে কে? সেদিন রাত্রিবেলা গৃহদ্বার সময়মত খুলিল না দেখিয়া নানা জনে নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন শিষ্যা* অকস্মাৎ পূজাগৃহের দ্বারে যাইয়া আঘাত করেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না, সুতরাং আঘাতমাত্রই খুলিয়া যায়। খুলিবামাত্রই গৃহাভ্যন্তরে যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল তাহাতে শিষ্যাটি বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। দেখিলেন, বাবাজী একটি ক্ষুদ্র শিশু হইয়া উত্তানভাবে শয়নপূর্ব্বক নিজের পা নিজে চুষিতেছেন। বাঁকুড়া-অযোধ্যানিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল-এম-এস, প্রভৃতি সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমানে ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ফলিত-জ্যোতিষের ব্যবসায় করিতেন। তিনি কখনও কখনও বাবাজীর নিকটে রাণীগঞ্জের বাড়ীতে আসিতেন ও খানিকক্ষণ বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। বাবাজী পৃথক্ আসনে বসিতেন। দর্শক ও ভক্তমণ্ডলীর জন্য পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্ষেত্রবাবু নিজেকে অত্যন্ত গুণী বলিয়া জানিতেন। তিনি সাধারণ আসনে বসিতে সঙ্কোচ বোধ

* ইনি আলীপুর কোর্টের Deputy Superintendent of Police শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে মহাশয়ের পত্নী।

করিতেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই তিনি প্রথম দিন আসিয়া বাবাজীর আসনের একদেশে উপবেশন করেন। প্রথম দিন বাবাজী কিছু বলেন নাই, কিন্তু পরদিনও যখন সেই প্রকার একাসনে বসিতে যান, তখন বাবাজী তাঁহাকে বসিতে নিষেধ করেন ও পৃথক্‌ভাবে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ক্ষেত্রবাবু নিষেধ-বাক্য শুনিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করেন ও বলেন—"আপনিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ। আমারও বহু যজমান ও শিষ্য আছে—সমাজে আমারও প্রতিষ্ঠা আছে। তদ্ব্যতীত, আমি বয়সেও প্রবীণ, সুতরাং আমার প্রতি আপনার ব্যবহার অত্যন্ত অগৌরবজনক বলিয়াই আমার মনে হয়।" শুনিয়া বাবাজী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যে মশায়, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে আপনি তাহা জানেন না। আপনি শুধু কুলক্রমাগত ব্রাহ্মণ্যের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন। যদি নিজে যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন তবে সম্মানের জন্য এত লালায়িত হইতেন না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি কি কখনও সম্মানের প্রত্যাশা করেন? তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন, অন্য গৌরব তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রাদি দেবগণের পদকেও হীন মনে করেন। শাস্ত্রে আছে, স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।" ক্ষেত্রবাবু বলিলেন,—"আজকাল কি আর সে ব্রাহ্মণ আছে! সে কাল নাই, সে ব্রহ্মতেজঃও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নেত্র হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত, আজকাল কোন্ ব্রাহ্মণের সেই প্রকার ক্ষমতা আছে?" বাবাজী বলিলেন,—"হাঁ, আপনি সত্য

বলিয়াছেন। কালপ্রভাবে এখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দুর্লভ হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু এখনও একেবারে লুপ্ত হন নাই। এখনও যিনি ব্রাহ্মণোচিত আচার ও সাধনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ঐ প্রকার কত ক্ষমতার বিকাশ হইয়া থাকে। শুধু নেত্র কেন, ব্রাহ্মণের সব অঙ্গ হইতেই তেজঃ নির্গত হয়—ব্রাহ্মণের দেহ অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন।" এই বলিয়া বাবাজী ক্ষেত্রবাবুর দিকে একটু অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দৃষ্টিপাতমাত্রই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চাদরটিতে আগুন লাগিয়া গেল। ভদ্রলোক চাদরটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন—কয়েক মিনিটের মধ্যে চাদরখানা দগ্ধ হইয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শুধু নয়ন-রশ্মি দ্বারা দূর হইতে বস্তুকে দগ্ধ করা—তিনি জীবনে এই প্রথম দেখিলেন। এবার তিনি বুঝিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের ক্ষমতা কত অধিক।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

দাদাগুরুদেবের আদেশে বর্দ্ধমানে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে কিছু সময় আবশ্যক হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা ছিল, ততটা হয় নাই। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে এই আশ্রমটি অবস্থিত। বাবাজীর গুরুদত্ত নামানুসারে ইহা "বিশুদ্ধাশ্রম" নামে পরিচিত। আশ্রম নির্ম্মিত হইবার পরেই তাহার পরিচালনার জন্য দাদাগুরুদেব কতকগুলি নিয়ম বন্ধন করিয়া দেন।

আশ্রম এখনও সেই নিয়মানুসারেই পরিচালিত হইতেছে। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ নিয়মাবলী হইতে নিম্নে কয়েকটি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যথা—

(ক) শিষ্যগণ যোগকর্ম্মে অবহেলা না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং যখন তাহাদের যে বিষয় জানিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হইবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দেখাইয়া বা বলিয়া দিবে। ঠিক অধিকারী না হইলে দেখাইবে না, বুঝাইয়া দিবে।

(খ) শিষ্যগণের সহিত যোগ বা শাস্ত্র ও গোপনীয় কোন বিষয়ের কথোপকথন হইলে সেখানে যেন অন্য কেহ না থাকে এমন কি, উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্য শিষ্যকেও থাকিতে দিবে না। গুহ্যবিষয় ব্যক্ত হইলে সমূহ ক্ষতি জানিবে।

(গ) বিষয়-কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে কোন কার্য্য লইয়া আশ্রমে কেহ না আইসে বা না থাকে।

(ঘ) তুমি যোগ-জ্যোতিষদ্বারা কাহারও সম্বন্ধে কোন বিষয় দেখিবে না, বা বলিবে না। এমন কি তোমার আত্মীয়দিগের সম্বন্ধেও দেখিবে না, বা বলিবে না। যদ্যপি দেখ বা বল, তাহা হইলে তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস হইবে।

(ঙ) কাহারও কোন ব্যাধি বা কোন সম্বন্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা কার্য্য করিবে না। করিলে তোমার ক্রিয়ার ধ্বংসের কারণ জানিবে।

(চ) আশ্রমে আসিয়া কোন সন্ন্যাসী, যোগী, বৈষ্ণব, ভৈরবী, ব্রহ্মচারী—যাঁহারা কর্ম্মী হইবেন তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পাইবেন। তাঁহাদের বিষয় সকলেই লক্ষ্য রাখিবে। কর্ম্মী বা যথার্থ ভক্ত না হইলে আশ্রমে থাকিতে পাইবে না।

(ছ) কোন স্ত্রীলোক সহসা আশ্রমে আসিতে পাইবে না। আসিলে আশ্রমে থাকিতে পাইবে না। শিষ্যগণের স্ত্রী প্রভৃতি সকল সময়ে আসিতে পাইবে, কিন্তু নিকটস্থ এক প্রহর ও দূরস্থ এক দিবস থাকিতে পাইবে। একমাস হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র, কন্যা লইয়া কেহ আশ্রমে আসিতে পাইবে না। যদি আইসে, অন্যত্র সন্তান রাখিয়া আসিবে এবং তৎক্ষণাৎ যাইবে।

(জ) আশ্রমে অপরিচিত ব্যক্তি বা স্ত্রীলোক আসিলে রাত্রে থাকিতে দিবে না।

এই সকল নিয়ম শ্রীমদ্ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের বিধান। ভাল করিয়া নিয়মগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,

আশ্রমের উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে ইহারা কতটা উপযোগী। আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা এবং বাবাজীকে গুরুরা ছাড়াইয়া আনিয়া আশ্রমে স্থাপিত করার কোন বিশেষ সার্থকতা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এক ভাবে ভাবিত ও এক পথের পথিক সাধকগণ যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের আনুকূল্য সম্পাদন পূর্ব্বক জীবনের পথে চলিতে পারেন, তাহার সহায়তার জন্য আশ্রমের উপযোগিতা আছে; আশ্রম একটি কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের অধ্যাত্ম-রাজ্য গঠিত ও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে, ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যদেশে, ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা— যে সকল শিষ্য যথার্থ কর্ম্মী, তাহাদিগকে সময় বিশেষে সঙ্গে রাখিয়া অনেক গুহ্যতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে হয় ও ভাল অধিকারী হইলে সংশয় নিরসনের জন্য অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যষ্টিভাবে কিংবা সমষ্টিভাবে এইরূপে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা আছে। অথচ ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ তত্ত্ব সকল বাহ্য-জগতের নিকটে প্রকাশিত করাও উচিত নহে। তাহাতে নানা প্রকারে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বহু শিষ্যের অবস্থানোপযোগী একটি কেন্দ্র স্থাপন ব্যতিরেকে এইরূপ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বর্দ্ধমানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইহা একটি প্রধান কারণ। উপরি লিখিত (ক) (খ) ও (গ) নিয়ম এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ লৌকিক কার্য্য-সাধনের

জন্য নিষিদ্ধ ; শাস্ত্রেও তাহার ভূরি ভূরি নিষেধ আছে। একবার তীব্রভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিতে অনেক সময় আবশ্যক হয়। দেহ বিকারশীল, ব্যাধিসঙ্কুল—তাহার ব্যাধি নিবৃত্তির জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অবৈধ। ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কোন কার্য্য নাই—সৃষ্টি ও সংহার পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহার দ্বারা সম্ভবপর হয়। যোগীর ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে এমন ক্ষমতা ত্রিভুবনে কাহারও নাই। রোগীর রোগ প্রতিকার ইচ্ছাশক্তির পক্ষে নিমেষমাত্রেরও কার্য্য নহে। কিন্তু এই সব কার্য্যের জন্য ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নহে। (ঙ) চিহ্নিত নিয়মে স্পষ্টভাবে লৌকিক কার্য্যের জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ নিষেধ করা হইয়াছে। * যোগজ্যোতিষ, ইচ্ছাশক্তি,

---

* এই সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক প্রকার শঙ্কার উদয় হইতে পারে। সুতরাং সংক্ষেপতঃ এখানে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি যোগিগণ লৌকিক কার্য্যের জন্য ইচ্ছা প্রয়োগ করেন না ? ঋষি ও মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের জীবন অলৌকিক ঘটনাতে পরিপূর্ণ। এই সব ঘটনা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। স্থলবিশেষে সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণ বশতঃ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত বিকৃত হইয়া থাকিলেও সর্ব্বত্রই যে তাহা হইয়াছে তাহা মনে করিবার হেতু দেখিতে পাওয়া না। সুতরাং এই সকল ঘটনার কারণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের আশঙ্কা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি প্রকৃত যোগী, যিনি ঐশী ইচ্ছার সহিত নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংগত করিয়া অভিমানরহিত হইয়াছেন, তিনি কখনই স্বার্থ-সাধনের জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। জ্ঞানী কখনও

দেবজ্যোতিষ, মন্ত্রশক্তি কিংবা অন্যান্য যে সকল অলৌকিক শক্তি আছে, তাহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তবে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রয়োগের কোন প্রতিবন্ধক নাই। অন্যান্য নিয়মের উদ্দেশ্য—আশ্রমের শৃঙ্খলা স্থাপন, বিশুদ্ধি সংরক্ষণ ও বৈষয়িক ভাবের নিয়ন্ত্রণ। আশ্রমে বিষয়-চর্চ্চা করা কিংবা বৈষয়িক কার্য্য-সাধনের জন্য আশ্রমে আগমন করা, আশ্রমের মূলনীতির বিরুদ্ধ। দেবগৃহে যেমন শুদ্ধ ও পূত না হইয়া প্রবেশ

পরমার্থের হানি করিয়া স্বার্থের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন না। তবে একটি কথা আছে। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকেন। তখন তাঁহাদের পৃথক্ ইচ্ছা থাকে না। সেই অবস্থায় যদি তাঁহাদিগের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়, তবে উহা ঐশ্বরিক ইচ্ছা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। উহার জন্য তাঁহাদিগের নৈতিক দায়িত্ব নাই। কারণ ঐ অবস্থায় তাঁহারা ঐশ্বরিক সত্তার সহিত অভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত। কিন্তু যখন তাঁহারা যুক্ত অবস্থায় না থাকিয়া যুঞ্জান অবস্থায় থাকেন, তখন অবশ্যই ক্ষীণ হইলেও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উন্মেষ সম্ভবপর। উপরিলিখিত (ঙ) চিহ্নিত নিয়ম এই অবস্থার জন্য উদ্দিষ্ট বুঝিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মাত্রই তাহাই। ইচ্ছা কামনা-বিশেষ। ইহা যেমন অধ্যাত্ম জগতের সর্ব্বপ্রধান মিত্র, তেমনই সর্ব্বপ্রধান শত্রুও বটে। পরমার্থের জন্য কামনা সকল প্রকার মঙ্গলের নিদান, বিষয় কামনা যাবতীয় অনর্থের প্রসূতি। পরমার্থ ভিন্ন যাহা কিছু সবই স্বার্থ। ইহাই বিষয়। বিষয়-কামনা উৎপন্ন হইলেই চিত্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, বিষয়ের কিছু অংশ তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে—ফলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু আত্মকামনার ফলে চিত্তের বিক্ষেপ দূরীভূত হয়, একাগ্রতা সম্পন্ন হয়, অবশেষে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়।

করা নিষিদ্ধ, আশ্রমেও তেমনই বৈষয়িক ভাব যথাশক্তি মনঃ হইতে পরিহার না করিয়া প্রবেশ অসঙ্গত। তাহাতে স্থানের প্রভাব মলিন হইয়া যায়।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী রচিত হইল। আশ্রমের কার্য্যও যথাবিধি চলিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গুলাশ্রম স্থাপনের পরে পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী লিখিয়াছিলেন,—"আশ্রমের অধিকারী তুমি নও, তোমার শিষ্যেরা।" বর্দ্ধমানাশ্রমের সম্বন্ধেও ঐ আদেশ অপরিবর্ত্তিত রহিল। বাবাজী নিষ্কাম ও মমত্ববর্জ্জিত হইয়া আশ্রমের অধিষ্ঠাতা হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিনি কোনদিনই লেশমাত্র কাতর হন নাই। যখন তাঁহার জননী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরলোক গমন করেন, তখনও তিনি ধৈর্য্য, সংযম ও চিত্তের উপশম হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও চ্যুত হন নাই। এ প্রকার অদ্ভুত আত্মসংযম অতি বিরল। শাস্ত্র বলেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ", অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে শোকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনি শোক-মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিরানন্দ ও পরমা শান্তি উপভোগ করেন। বাবাজীর জীবন হইতে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়। জীবন ও মরণ যাঁহার দৃষ্টিতে তুল্যমূল্য, তিনিই জীবন ও মরণের উর্দ্ধে শাশ্বতধামে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী লিখিয়াছেন—"সকলেই ক্রিয়া

করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা-বাঁচা স্থূলের খেলা।" তাই জ্ঞানী কখনও স্থূলের খেলায় মোহিত হন না।

বর্দ্ধমানে 'বিশুদ্ধাশ্রম' প্রতিষ্ঠার পরে শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বহু স্থানে তদ্রূপ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে,—ঝালদায় 'বিশুদ্ধনিবাস', ৺পুরীক্ষেত্রে 'বিশুদ্ধানন্দ-ধাম' ও ৺বারাণসীতে 'বিশুদ্ধানন্দ-কানন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, ৺বৈদ্যনাথ ধাম, ধানবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রম না হইলেও তাঁহার অনুরূপ আবাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে নিকটবর্ত্তী ভক্ত ও জিজ্ঞাসুগণ তাঁহার নিকটে একত্র সম্মিলিত হইতে পারেন। *

বর্দ্ধমান আশ্রমে শ্রীশ্রীগোপাল ও শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। বণ্ডুলাশ্রমে যেমন প্রতি বৎসর ৺শিবরাত্রির সময় বিশেষ

---

* ঝালদা মানভূম জেলার অন্তর্গত ও পুরুলিয়া হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। B. N. R. নামক রেল লাইনে ঝালদা নামে একটি ষ্টেশন আছে। এখানকার স্থানীয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র সিংহ মহাশয় বাবাজীর একজন ভক্ত শিষ্য। তিনি ঝালদা আশ্রমটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ৺পুরীধামের আশ্রমের নির্ম্মাণ ও ব্যবস্থাদির সমস্ত ব্যয়ভার কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, বাবাজীর পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি আর্মষ্ট্রং রোডের উপরে পুরী জেলা-স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত। ৺কাশীধামে দুইটি আশ্রম স্থাপিত হয়। প্রথমটি গঙ্গার হনুমান্ ঘাট হইতে অদূরে দিলীপগঞ্জ নামক মহল্লায় অবস্থিত। বাবাজীর ভক্ত শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের

সমারোহের সহিত উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার বর্দ্ধমান আশ্রমেও হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষ্যে দূর ও নিকট নানাদেশ হইতে বহু ভক্ত এবং শিষ্য উৎসবে যথাবিধি যোগদান করিবার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বাবাজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৺শিবরাত্রি একটি বিশিষ্ট উৎসব। অনেকেই এই সময়ের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভৃগুরাম স্বামী বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহার শক্তির মহিমা শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই অনুভব করিবেন। বস্তুতঃও তাহাই হইয়া থাকে। এই উৎসবের ন্যায় ব্যাপকভাবে না হইলেও বর্দ্ধমানে ৺জন্মাষ্টমীর সময় বেশ সমারোহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র উৎসব ও কুমারী-ভোজন প্রভৃতি নানা প্রকার নৈমিত্তিক উৎসব প্রতিমাসে এক প্রকার লাগিয়াই আছে।

উকীল, ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া ও তাহাতে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই আশ্রমটি বাসোপযোগী করিয়া দেন। ইহার নাম 'বিশুদ্ধানন্দ-কুটীর।' দ্বিতীয়টি বেনারস ক্যান্টন্‌মেণ্ট রেল-ষ্টেশনের সমীপে, মালদহিয়া মহলে একটি বাগানে অবস্থিত। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সম্মিলিত উদ্যোগে এই বৃহৎ বাগান ও আশ্রমটি ক্রীত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম 'বিশুদ্ধানন্দ কানন।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হিমালয়ের যোগাশ্রমে যে প্রকার যোগ, বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনার ব্যবস্থা আছে, বাবাজী তাহারই অনুকরণে লোকালয়ে ক্ষুদ্র ভাবে উহা প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই জন্য ৺কাশীধামের 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' নামক আশ্রমে একটি 'শিক্ষামন্দির' ও একটি 'বিজ্ঞান-মন্দির' নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পুর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্দিরের উর্দ্ধদেশে একটি নীলরক্তাদিবর্ণময় কাচের ক্ষুদ্র গৃহের আয়োজন এখনও চলিতেছে। এই কাচের গৃহ নির্ম্মিত ও যথাবিধি সুসজ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানঘটিত প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। বহুসংখ্যক এক-ইঞ্চ-গভীর, সুবৃহৎ, স্বচ্ছ ও রঞ্জিত কাচখণ্ড দ্বারা এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পরে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতুময় স্থূল ও সূক্ষ্ম তারের দ্বারা সমগ্র মন্দিরটিকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। কাচ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আশা আছে, কাচ সংগৃহীত হইলেই অদূর ভবিষ্যতে মন্দিরের উদ্দিষ্ট কার্য্য আরব্ধ হইতে পারিবে।

যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-জগতের শিরোমণি, যাহা অধিকার করিতে পারিলে জীব যাবতীয় অভাব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া নিজের জন্মকালীন উপাদান, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রকৃতি, আমূল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে, যাহা

ভারতবর্ষের নিজস্ব হইলেও এখন দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে, যাহা অতি দুষ্কর ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকালের সাধনাদ্বারা তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় লুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি ইহা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে জগতের কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। এই বিজ্ঞানের ক্ষমতা অসাধারণ, এমন কি, অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবাজী বলেন যে, যোগশাস্ত্রে এমন কোন অলৌকিক সিদ্ধির বর্ণনা নাই, যাহা অপেক্ষাকৃত সুগম উপায়ে এই বিজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা না যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে, শিব-পুরাণাদি পৌরাণিক গ্রন্থে, তন্ত্র-শাস্ত্রে, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের যোগবিষয়ক গ্রন্থাদিতে, সুফী ও খৃষ্টীয় যোগিগণের গ্রন্থমালায়, এমন কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই, যাহা সূর্য্য-বিজ্ঞানবিদের পক্ষে অলভ্য।

আমরা বর্ত্তমান যুগে 'বিজ্ঞান' শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, সূর্য্য-বিজ্ঞান ঠিক সে জাতীয় বিজ্ঞান নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একজন পরম যোগী, যিনি অধ্যাত্ম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পদে আরূঢ়, তিনি ইহার দিকে এতটা আকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। 'বিজ্ঞান' বলিতে বাবাজী কি বুঝিয়া থাকেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রের (গ্রন্থকারের নিকট লিখিত) উদ্ধৃত অংশ হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"বৎস, সমস্তই তাঁহার

ইচ্ছা। উক্ত ইচ্ছাময়ীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সকল বিষয়েই বেশ জানা যায়। উক্ত ইচ্ছাময়ীর কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শক্তি হয় না। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন? শুদ্ধ স্বভাবের ভাব ও গুণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করে ও অনেক জানিয়াছে—জানিয়া মায়া-জনিত দুষ্কর প্রলোভন হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে বলিয়া। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাপজনিত তাপ হইতে নিস্তার পায়, আর না হয়, এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পাদ্যজ্ঞান বলে। ইহাও দুইভাগে বিভক্ত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যাঁর দ্বারা সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি কে, কেন এরূপ করিতেছেন ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। ইহার পরাবস্থা,—সৃষ্টি লয় যিনি করেন তাঁহাকে যিনি করেছেন * ঘোররূপিণী মহাশক্তি ব্যোমাতীত, তাঁর বিষয় জানার নাম বিজ্ঞান। জগৎ মিথ্যা, এক তিনিই সত্য।" (৺পুরীধাম হইতে ২১ বৈশাখ, ১৩৩২ এ লিখিত পত্র।) তাঁহার অন্য একখানা পত্রে আছে—"বৎস, যাহা দেখিতেছ, তাহা মহাশক্তির ব্যাপার। সচরাচর মানবের চিন্তাশক্তি জড়ের অন্ধশক্তিতে অন্ধীভূত হইয়া বিবিধ ভাবে ভ্রমণ করে, মহাশক্তি-বিজ্ঞান-তত্ত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। সর্ব্বব্যাপিণী শক্তিতে স্থূলতা-বোধ যে ভুলের কথা ও তদ্দ্বারা যে মহাশক্তির জ্ঞান সম্ভবে না, এ বিষয়ে

* আর এক স্থলে বাবাজী লিখিয়াছিলেন—"যিনি সকলের মঙ্গলপ্রদ ও সকলের আধারে বর্ত্তমান এবং জ্ঞান ও নির্ব্বাণ-মুক্তির মূল, তাঁহাকে যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন, এই আমার ইষ্ট" (গুমো হইতে ২০শে মাঘ, ১৩৩৩এ লিখিত পত্র)।

সহজেই জানা যায়। মহাশক্তি-জ্ঞান ও তাঁহার চিন্তা উভয়ই প্রবল যোগে স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক পরিমিত পদার্থ কর্ত্তৃক চালিত নয়। উহাদের গতি মহাকাশভেদী একমাত্র মহাশক্তিতে। এই মহাবিজ্ঞান চিন্তার মধ্যবর্ত্তী আর কেহ নাই। ইহা মহাশক্তির কৃপাতে ফুটিয়া উঠে। মানব-হৃদয়ে যদি সর্ষপ-সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে তাহা হইলে অখণ্ড মহামায়াকে বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তার যে জ্ঞান, উক্ত জ্ঞানের উজ্জ্বলতেজে সকল প্রকার পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, আসক্তির আবর্জ্জনা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে মহাশক্তির জগৎশক্তির জ্ঞানামৃত প্রকাশ হইয়া কলুষিত সন্তপ্ত চিত্ত মহাআবরণ হইতে পরিত্রাণ পায়ই পায়। বাহ্যিক ব্যাপার সমস্ত ভুলিয়া যায়। মহামায়ার কৃপা বিজ্ঞান-বলে মহাশক্তির মহাতত্ত্ব স্থূল জগতে আনিতে পারে। সীমাশূন্য মহাশক্তির মহাবিজ্ঞান-আলোকে প্রাণে যে কি হয়—যার হইয়াছে সে-ই জানে। ভাষা নাই, ভাষা থাকিলে লিখিতাম। বেশ বুঝা যায়, যোগ ও বিজ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।” (৭ই ফাল্গুন, ১৩২৯, ৭নং কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর—কলিকাতা হইতে লিখিত।)

এই সকল পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানের সারাংশই বিজ্ঞান। তত্ত্ববস্তুকে সামান্য ভাবে জানার নাম ‘জ্ঞান’, আর উহার অশেষ বিশেষ জানিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন করার নাম ‘বিজ্ঞান’। জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার তুরীয় ভূমি পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তুর্য্যাতীত মহাশক্তির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, যিনি সকল তত্ত্বের

অতীত হইয়াও পরম তত্ত্ব, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, বিজ্ঞান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জ্ঞানীর চিত্তও ভগবতী মহামায়ার মায়াচক্রে পতিত হইয়া মোহাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে পারে, এমন সম্ভাবনা আছে—কিন্তু জ্ঞান যখন বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যখন এক পক্ষে শুদ্ধা ভক্তি ও অপর পক্ষে শুদ্ধা কৃপা উদিত হইয়া মহাশক্তির সুশীতল অঙ্কে ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শিশু যখন জননীর হস্ত অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে, কারণ দুর্ব্বল শিশুর ক্লান্ত মুষ্টি স্খলিত হইতে কতক্ষণ লাগে? কিন্তু যখন জননী স্বয়ং শিশুকে করাবলম্বন দান করেন, নিজ হস্তে শিশুকে ধরিয়া চালাইতে থাকেন, তখন আর ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা এই প্রকার বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সমসূত্র হইয়া উভয়ই নিষ্প্রভতা প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত ও অদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য, গতি ও স্থিতি সমভাবে দর্শন করিতে হইলে, বিজ্ঞানই একমাত্র আশ্রয়। এই প্রসঙ্গে বাবাজীর আর একখানা পত্র হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৎস, সকল শক্তির মূল যে শক্তি তিনিই প্রথম ও শেষ,—সকল বিষয়ে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি শক্তি সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগৎ, সকল দেব-দেবী,—যাহা কিছু আছে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না, আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী দ্বৈতাদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য লীলায় সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ,

পিতা-পুত্র, সেব্য-সেবক প্রভৃতি লইয়া মজার খেলা করিতেছেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। আর যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সে-ই কিছু কিছু জানে। জীবাত্মা, স্বরূপ-আত্মা, পরমাত্মা, স্থূল-আত্মা, ভুল-আত্মা প্রভৃতি যাহা আছে, সবই মহাশক্তি মায়ের ভাব। এ ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। বাবা, অসার যুক্তি-তর্কে ত কিছু পাওয়া যায় না—প্রত্যক্ষ জিনিষের আবার যুক্তিতর্ক কি? জগৎ-প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা-যোগে ব্রহ্মাতীত-মা-মহাভাবতত্ত্বের সারমর্ম্ম ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে সর্ব্বদাই গ্রহণ কর, বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্ব্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলেই সব হইবে।" (১৭ই চৈত্র, ১৩৩২, ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর হইতে লিখিত)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের সহিতই সবিতৃতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্যে সংযম করিলে যে ভুবন-জ্ঞান হয়, যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে আছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সূর্য্যই সকল পদার্থের প্রসব-কর্ত্তা, মূল স্তম্ভ ও কেন্দ্র-স্বরূপ। সূর্য্যালোকেই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ প্রকাশমান হয়। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই সৃষ্টির মধ্যে সূর্য্যই একমাত্র প্রকাশক। সূর্য্য হইতে যে তেজোধারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া যাইতেছে, তাহাকে সংযত করিয়া একমুখে প্রবাহিত করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ জ্ঞানহীন হইবে,—বাহ্যজ্ঞান, ভেদজ্ঞান—সব লুপ্ত হইয়া যাইবে। সূর্য্য-রশ্মির বিক্ষেপ হইতে জাগতিক জ্ঞানের উদ্ভব। যখন

রশ্মির সংঘাত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন জীবেরও বিক্ষিপ্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া একাগ্রজ্ঞানের উদয় হইবে। তারপর সেই সংহত রশ্মি, সেই কেন্দ্রীকৃত ঘনীভূত প্রভা-রাশি, যখন সূর্য্যমণ্ডল ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন প্রণবের আলোকে পরম-তত্ত্ব প্রকাশমান হইতে থাকিবে, প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী শক্তি আহতা ফণিনীর ন্যায় ঘোর নাদ সহকারে ব্রহ্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাব্যোম-রাজ্য ভেদ করিয়া ব্যোমাতীত মহাশক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাই বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ। যাহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে হয়, ক্ষুদ্র দেহরূপ পিণ্ডেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে।

সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের বিকাশ। সূর্য্যালোকে দেহ-মধ্যস্থ ইড়ামার্গ-সঞ্চারী চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ অমৃত-ধারায় সমস্ত দেহকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। পিঙ্গলাবর্ত্তী সূর্য্য যখন ক্রিয়া-কৌশলে প্রবল তেজোময় রূপ ধারণ করে, তখন তাঁহারই সংস্পর্শে মধ্যশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া বাম পার্শ্বস্থ ইড়ামার্গে সঞ্চরণশীল চন্দ্রমাকে উগ্রভাবে পরিণত করে। ক্রমশঃ দক্ষিণশক্তি, মধ্যশক্তি ও বামশক্তি—তিনটি শক্তিই সমভাবে উত্তেজিত হয়, ত্রিকোণের তিনটি কোণই সমরূপে বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ তিন শক্তি সমষ্টিভূত হইয়া মধ্যস্থ ব্রহ্মবিন্দুকে আঘাত করিয়া জাগাইয়া দেয়—ইহাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ অথবা মন্ত্র-চৈতন্য-সম্পাদন। সুতরাং সূর্য্যের প্রবলতা দ্বারাই চন্দ্র-সূর্য্যের সাম্য স্থাপিত হয়, পরিশেষে সুষুম্নার সহিত অভেদ সম্পন্ন হয়। যখন এই তিনটি পৃথক্ স্রোতঃ এক খাতে পতিত হইয়া সামঞ্জস্য লাভ করে তখন

স্বভাবতঃই অদ্বৈতমার্গ উন্মুক্ত হয় ও সেই মুক্ত আলোকে তত্ত্ববস্তুর দর্শন হয়। একাগ্র ভূমির অবসানে নিরোধ আয়ত্ত না হইলে, চিত্তবৃত্তির ঐকান্তিক নিবৃত্তি না হইলে, স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞানতত্ত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। মহাশক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একাগ্রভূমির জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ বিজ্ঞান শক্তির আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

তন্ত্রের মাতৃকাতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব গভীরভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহাতে সূর্য্য-বিজ্ঞানেরই রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই মাতৃকা-মণ্ডলের ক্রিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষড়ধ্বার বিচার প্রসঙ্গে একদিকে পদ, মন্ত্র ও বর্ণ এবং অপরদিকে ভুবন, তত্ত্ব ও কলার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ণ ও কলা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিজড়িত। শিব-শক্তির ন্যায় বাক্ ও অর্থ নিত্যসম্বদ্ধ। বস্তুতঃ অকারাদি বর্ণ-মালা শুদ্ধাবস্থায় বিক্ষুব্ধ সবিতৃবিন্দু হইতে নিঃসৃত নাদময় রশ্মিচক্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শব্দব্রহ্ম-রূপ হিরণ্যগর্ভ বা সবিতা কেন্দ্রস্থলে, ব্যোমমধ্যে, এক ও অখণ্ড থাকিয়াও বাহ্যভাবে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর কম্পনে ঊনপঞ্চাশৎ বর্ণ বা রশ্মিরূপে বহির্গত হইতেছেন। এই পঞ্চাশৎ বর্ণই ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে অকারাদি-ক্ষকারান্ত বর্ণমালা বা অক্ষমালারূপে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ছয়টি চক্রের মধ্যে পঞ্চাশৎ দলে প্রকাশমান হইতেছে। এই বর্ণ বা নাদের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না, কারণ "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" শব্দ হইতেই

জগতের সৃষ্টি, আবার শব্দেই লয়—এমন কি, সৃষ্টি ও লয়ের অতীত, সঙ্কোচ-প্রসারণের ঊর্দ্ধস্থিত, অচ্যুত ব্রহ্মবিন্দুতে যাইতে হইলেও মন্ত্ররূপী শব্দই কর্ণধার। দেবতাদির দেহও এই মন্ত্রময় জ্যোতিঃর দ্বারাই গঠিত। যন্ত্রাদির স্বরূপও তাহাই। শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা আত্মসংস্কার করিয়া এই বিদ্যাধামের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিলে, অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বরাদি পদ প্রাপ্ত হইলে, বর্ণ-মালার উপর অধিকার জন্মে ;—তখন সকল মন্ত্র ও দেবতা কিঙ্করবৎ তাঁহার অধীন হইয়া যায়। তিনি গুরুপদ-বাচ্য সদাশিবাবস্থা লাভ করেন। প্রণব ও ব্যাহৃতির রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে বেদেও এই বিন্দু ও নাদের সাধনাই দেশোচিত ও কালোচিত নানা আকারে অধিকারভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় মত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য যোগ সিদ্ধান্ত, সুফী মত এবং অন্যান্য দেশের অন্তরঙ্গ সাধন-প্রণালী, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সর্ব্বত্র এই একই বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। অনধিকারী লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির সকল ব্যাপারই রঙ্গের খেলা—যে নির্লিপ্ত দর্শক, সে তটস্থভাবে দেখিতে পায় যে, একটি সর্ব্বব্যাপক শুভ্রসত্ত্বময় বর্ণের উপর নীলরক্তাদি অনন্ত প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র বর্ণের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। ফলতঃ জলবুদ্বুদের ন্যায় বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল রচিত হইতেছে, অজ্ঞানীর রঞ্জিত নেত্রে ঐ ইন্দ্রজাল বা মায়িক ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। যতক্ষণ চক্ষুঃ হইতে বর্ণের আবেশ না কাটিবে, যতক্ষণ মোহ নিবৃত্ত না হইবে,

ততক্ষণ মিথ্যাদর্শন কাটিবে না। যে শুভ্র ভিত্তির উপর এই অপরূপ মায়াচিত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহাকে যথার্থভাবে দেখিতে না পাইলে এই বিচিত্র জগদ্দর্শনে মোহিত হইতেই হইবে। বৈচিত্র্যের অন্তঃস্থিত সেই ব্যাপক ও অখণ্ড ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করিতে হইলে, চিত্তের ও তৎসহকারী ইন্দ্রিয়গণের মার্জ্জনা আবশ্যক। যে সকল বাসনাত্মক চিত্র-বিচিত্র বর্ণরাশি অন্তর্দ্দর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চিত্ত স্বয়ং শুভ্র হইলে শুভ্রসত্ত্বময় জগদাধারকে সহজেই দেখিতে পায়—তখন মায়াবীর মায়া ধরিতে বিলম্ব হয় না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এই বিরাট্ ইন্দ্রজালের মূলসূত্র আবিষ্কার করা। বর্ণমালার সংযোগ ও বিয়োগ হইতেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। সৃষ্টি ও প্রলয় এই সংযোগ ও বিয়োগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। বিজ্ঞানবিৎ কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্তের স্বরূপ বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া বিধাতার কলা-কৌশল সাক্ষাদ্ভাবে ধরিতে পারেন। এমন কি কিয়ৎপরিমাণে বিধাতার ঐশ্বর্য্যও আয়ত্ত করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে। ইচ্ছা করিলে বিধাতাকেও অতিক্রম করিয়া সর্ব্বমূলভূতা অনাদি মহাশক্তির শ্রীচরণপর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন। বিশ্বামিত্রের জগন্নির্ম্মাণ, ভণ্ডাসুরের নবীন ও বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড-রচনা, সাধন-রাজ্যের ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ ঘটনা নহে।

গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয় আবশ্যক, তদনন্তর বর্ণের সংযোজন-প্রণালী শিখিতে পারা যায়,

তদ্রূপ বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম সোপান বিশুদ্ধ রশ্মির সহিত পরিচয় স্থাপন। সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে শুদ্ধবর্ণ চিনিয়া বাহির করিতে ও ধরিয়া রাখিতে পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন রশ্মির পরস্পর মিলন-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। বেদান্ত শাস্ত্রে পঞ্চীকরণ ও উপনিষদাদিতে ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়াকুশল মর্ম্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ ইহা বুঝিতে পারেন না। ইহা যে রশ্মি-সংযোজনেরই একটি অবস্থা মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখানে অধিক লেখা অনাবশ্যক। *

---

* 'সূর্য্য-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে যথাশক্তি বিস্তারপূর্ব্বক আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। তাহা পরবর্ত্তী ভাগে হইবে বলিয়া এখানে স্থূলভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। বহু লোকেই বাবাজীর কৃপায় সূর্য্যবিজ্ঞানের নানা প্রকার প্রয়োগ দেখিয়াছেন। ইংরেজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় পাশ্চাত্য ও দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার আলোচনাও করিয়াছেন। কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া সূর্য্য-বিজ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তিরই অবস্থাভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁহারা বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ইচ্ছাশক্তিতে উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। সত্যসংকল্প যোগীর ইচ্ছামাত্রই নিমেষের মধ্যে কার্য্য উৎপন্ন হয়,—বাহ্য উপাদানের আকর্ষণ আবশ্যক হয় না। ইহা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-বাদী বৈদান্তিকের সিদ্ধ বা অদ্বৈত ভূমির বহির্মুখ অবস্থা। উৎপলদেব বলিয়াছেন—"চিদাত্মা হি দেবোঽন্তঃ-স্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ। যোগীর নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ।" অভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য তাঁহার 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী'তে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ঈশ্বরসৃষ্টি ও যোগিসৃষ্টি উভয়ই নিরুপাদান। আত্মা

সূর্য্য-বিজ্ঞানের বহু ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখানে সে সমুদায় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে দুই চারিটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইতেছে। ইহা হইতেই কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন দিলীপগঞ্জের আশ্রমে আমি বাবাজীকে কথা-প্রসঙ্গে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। বাবাজী বলিলেন,—"দুইটি জিনিষের সংঘর্ষ না হইলে কোন কার্য্য

চৈতন্যস্বরূপ—তাহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছা-নিবন্ধন সেই অন্তঃস্থিত পদার্থ বাহিরে প্রকটিত হয় মাত্র। প্রচলিত ভাষায় ইহাকেই 'সৃষ্টি' বলে। সুতরাং সৃষ্টির জন্য আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই। বেদান্ত-সিদ্ধান্তও কিয়দংশে এই প্রকার। শুধু মায়ার স্থাননির্দ্দেশে উভয়ে ভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকাদি আচার্য্যগণ উপাদানের পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সত্যসংকল্প যোগীর সংকল্পমাত্রেই সর্ব্বগত পরমাণুমণ্ডল হইতে অভীষ্ট পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে ঝটিতি সম্মিলিত হয় ও ইচ্ছানুরূপ কার্য্যের রচনা করে। বলা বাহুল্য, উভয় মতেই ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল—তজ্জন্য জ্ঞানতঃ উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে উপাদানকে প্রত্যক্ষ ভাবে চিনিয়া লইতে হয় ও তাহার সংযোগ-বিয়োগ-প্রণালী যথাবিধি আয়ত্ত করিতে হয়। তদনন্তর যথাপ্রয়োজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি জ্ঞানপূর্ব্বক, যোগিসৃষ্টি ইচ্ছাপূর্ব্বক। উভয় প্রণালীতে পার্থক্য এই—প্রথম প্রণালীতে জ্ঞান অঙ্গী ও ইচ্ছা তার অঙ্গস্বরূপ, দ্বিতীয়ে ইচ্ছাই অঙ্গী ও জ্ঞান অব্যক্ত ভাবে তাহার অঙ্গরূপে বর্ত্তমান। যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ নহেন, অথচ যোগীও নহেন, তাঁহারা উভয়

উৎপন্ন হয় না। জগতে যে কোন বস্তু দেখিতে পাও, সব এই সংঘর্ষের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বিচার এখন ছাড়িয়া দাও। যাহা কিছু দেখিতে পাও সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রবল। সকল বস্তুতেই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অংশ আছে—অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত এই বিভাগ রহিয়াছে। যাহাতে প্রকৃতির ভাগ অধিক, পুরুষের অংশ অল্প, তাহাতে পুরুষ-ভাব অভিভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতিভাব প্রাধান্য লাভ করে। সেই প্রকার পুরুষাংশের প্রাধান্যবশতঃ পুরুষভাবের বিকাশ হয়। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুইটি প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ হইতে জাত হয় বলিয়া এই নিয়ম সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।" বাবাজীর আসনে একটি গোলাপ ফুল পড়িয়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা

প্রণালীর সূক্ষ্ম ভেদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উভয় সৃষ্টিই ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক মাত্র নহে। সুতরাং এই অংশে উভয়ে কোন পার্থক্য নাই। Hallucination, Hypnotic Illusion প্রভৃতি স্বপ্নদৃশ্যবৎ প্রাতিভাসিক সৃষ্টির নিদর্শন। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেরূপ স্বপ্নান্তে বিলীন হইয়া যায়, Hallucination প্রভৃতিও তদ্রূপ। ইন্দ্রিয়াদির বিকার প্রশান্ত হইলে তাহারা আপনিই মিলাইয়া যায়। যতক্ষণ প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই তাহাদের সত্তা। তাহারা ব্যাবহারিক জগতের কার্য্যসাধনক্ষম হয় না। তাহাদিগকে "দৃষ্টি-সৃষ্টি" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যোগি-সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ঐ প্রকার অচিরস্থায়ী বা মিথ্যা নহে। উহা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগতের ন্যায় তুচ্ছ হইলেও ব্যবহার ভূমিতে সম্পূর্ণ সত্য ও চিরস্থায়ী। জগতের অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ যে প্রকার, উহাও ঠিক সেই প্রকার। সত্যাসত্য নির্ণয়ের যে সকল pragmatic test আছে তাহা

করিলাম—"বাবা, এই গোলাপ ফুলটি স্ত্রী কি পুরুষ? ইহাতে প্রকৃতির অংশ অধিক আছে, কি পুরুষের অংশ অধিক আছে।" তিনি গোলাপ ফুলটিকে হাতে লইয়া একবার তাকাইয়া দেখিলেন। পরে বলিলেন যে, এটি স্ত্রী-পুষ্প এবং স্ত্রীর লক্ষণাদি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটি পুরুষ গোলাপ আনিতে পার কি? তাহা হইলে একটি ব্যাপার দেখাইয়া বুঝাইয়া দিব।" সেখানে অন্য ফুল ছিল না। তখন অপরাহ্ণ-ভ্রমণের জন্য বাহির হইবার সময় হইয়াছিল। আমি বলিলাম—"এখানে ত আর অন্য গোলাপ নাই। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে বাহিরে যাইয়া আনিতে পারি।" তিনি বলিলেন—"থাক্—প্রয়োজন নাই। তুমি এই গোলাপ

দ্বারা বিচার করিলে উহা সত্য বলিয়াই মানিতে হইবে। 'পঞ্চদশী' প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টিতে যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ও যোগিসৃষ্টি জীবসৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ ও তমোমিশ্র সত্ত্ব। এই উপাধি হইতে যে সৃষ্টির উদয় হয় তাহা প্রাতিভাসিক,—স্বপ্নদৃশ্যবৎ ভ্রান্তিজাল মাত্র। ইহা বন্ধনের হেতু। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্টি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা ঈশ্বরোপাধি হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া ব্যাবহারিক-সত্তা-সম্পন্ন—ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। পরমার্থদশাতে ব্যবহার-ভূমি অতিক্রান্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যবহারের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। যোগ ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই যোগ ও বিজ্ঞান বলে যে পদার্থ নির্ম্মিত হয় তাহা সত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

ফুলটির পাঁপড়িগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া ফেল। তার পর ওটি আমাকে দাও।” আমি তাহাই করিলাম। বাবাজী দলহীন পুষ্পটিকে হাতে লইয়া দুই একবার উর্দ্ধাধঃ সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন,—“সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে পুং-গোলাপের বীজ আকর্ষণ করিয়া পুষ্পটির গর্ভাধান করিলাম। এখন এইটিকে একটি ক্ষুদ্র কোমল আবরণের মধ্যে অথবা তোমার মুষ্টির অভ্যন্তরে কয়েক মিনিট আবদ্ধ করিয়া রাখ। বাহিরের শীতবায়ু যেন ইহাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে না পারে। দেখিবে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি অভিনব, বৃহদাকার ও অত্যন্ত সুগন্ধি গোলাপের সৃষ্টি হইবে।” দলহীন ফুলটিকে আমি নিজের মুষ্টি-মধ্যে রাখিলাম ও মাঝে মাঝে একটু একটু খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, একটি অতি বৃহৎ গোলাপফুল নির্ম্মিত হইয়াছে—ইহা আয়তনে ছিন্ন পুষ্পটির দ্বিগুণ হইবে। বর্ণ ও গন্ধেও উভয়ে অনেকটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাবা, যোগশাস্ত্রে আছে যে, প্রকৃতি বা উপাদানের আপূরণ—অনুপ্রবেশ বশতঃ একজাতীয় পদার্থ অন্যজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় (‘জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ’)। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর?” তিনি বলিলেন—“হাঁ, তা হইতে পারে। জগতের সকল পদার্থেই সকল পদার্থের উপাদান আছে। এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিতেছ, ইহাতে না আছে এমন কোন পদার্থ এ জগতে নাই। তবে গোলাপের উপাদান ইহাতে অধিক মাত্রায় আছে এবং

অন্যান্য উপাদান অল্প মাত্রায় আছে, সেইজন্য ইহাতে গোলাপের প্রাধান্যবশতঃ তাহারই ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অন্যান্য উপাদানের সত্তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি যোগী অথবা বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার দৃষ্টিতে সবই প্রতিভাত হয়। ইচ্ছা করিলেই তিনি ক্রিয়াকৌশলে যে কোন উপাদানকে বাহ্যজগৎ হইতে তাহার সজাতীয় উপাদান আকর্ষণ পূর্ব্বক পুষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত ছিল, তখন তাহা অভিব্যক্ত হইবে এবং যাহা অভিব্যক্ত ছিল তাহা ক্রমশঃ অব্যক্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রণালীতে জগতের যে কোন বস্তু যে কোন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। দেবভাব হইতে পশুভাব-প্রাপ্তি, আবার পশুভাব হইতে দেবভাব-প্রাপ্তি—উভয়ই সম্ভবপর। প্রকৃতির গুণ-প্রধান-ভাব হইতেই সৃষ্টির খেলা চলিতেছে। যে কোন বস্তুতে উপাদান-গত আপেক্ষিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা অদৃশ্য ও অব্যক্ত হইয়া যাইবে।” এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বকথিত গোলাপটিকে একটি জবাফুলে পরিণত করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত জাত্যন্তর-পরিণাম বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন। এই ক্রম-পরিবর্ত্তনের স্তরগুলি বেশ অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়।

আর একদিন অনুলোম ও বিলোম পরিণামের কথা উঠিয়া-ছিল। বাবাজী বলিলেন—“দেখ, উভয়বিধ পরিণামই সত্য। দুগ্ধ হইতে দধি হয়, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘৃতের মধ্যে দুগ্ধের উপাদান আত্মগোপন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। যিনি প্রকৃত কর্ম্মী, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন উপাদানকে আশ্রয় করিয়া বিলোমক্রমে ঘৃতকে

পুনরায় দুগ্ধে, এমন কি তৃণরাশিতে পরিণত করিতে পারেন। বালকের মধ্যে বৃদ্ধভাব আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই বালককে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ বৃদ্ধের মধ্যেও বাল্যভাব নিহিত আছে। তাই বৃদ্ধকে দেখিয়াও তাহার ভূতাবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং পরিণাম-ক্রমের দর্শন হইতেই স্বভাবের নিয়মে অতীতানাগত-জ্ঞান আপনিই উদিত হয়।" এই বলিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ-ফুলকে তিনি অস্ফুট কোরকাকারে পরিণত করিলেন। পরে সেই কোরকটিকে মার্শেল নীলের কোরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ফুটাইয়া তুলিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে ৺পুরীধামে আশ্রমে বসিয়া আছি, বাবাজী আহ্নিক করিয়া আশ্রমের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুই একটি ভক্ত পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। তখন হঠাৎ চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বচন আমার মনে পড়িল, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে ("মৃগমদ নীলোৎপল" ইত্যাদি) সেই স্থানটি স্মরণ-পথে উদিত হইল। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে তাহা কি স্নিগ্ধ?" তিনি বলিলেন—"কি কি দ্রব্যের সংযোগে ঐ গন্ধের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া লেখা হইয়াছে? একটি একটি করিয়া উল্লেখ করিয়া যাও।" আমি গোবিন্দ-লীলামৃতের মতানুসারে নীলপদ্ম, কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্যের নাম করিয়া যাইতে লাগিলাম; বাবাজী এক একটি নাম শুনিয়া

হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যখন সবগুলি দ্রব্য উল্লিখিত হইল, তখন হস্তমুষ্টি আমার নিকটে ধরিয়া বলিলেন—"এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের আঘ্রাণ গ্রহণ কর। যে যে জিনিষের নাম তুমি লইয়াছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই উপাদান আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি ও সম্মিলিত করিয়া দিয়াছি। দেখ, কেমন বোধ হয়।" দেখিলাম, অপূর্ব্ব দিব্যগন্ধ—জগতে তাহার তুলনা নাই। পরদিন একটি শিশি ভরিয়া ঐ অপূর্ব্ব গন্ধ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"বাবা, এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ শুধু নাম শুনিবামাত্র আপনি কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া লইলেন?" তিনি বলিলেন—"তাতে আর কষ্ট কি? যদি নিজের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে ও উপাদানের জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আর কঠিন কি আছে? যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির বিস্তার আছে, ততদূরে যাহা কিছু থাকুক, টানিয়া আনা যায়। বৃহৎ বৃহৎ স্থূল বস্তু পর্য্যন্ত বহু দূরদেশ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করা যায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সমস্ত জগৎটা বিধাতার যে অপূর্ব্ব কৌশলে চলিতেছে, তাহা তোমরা ধরিতে পার না। তাই তোমাদের নিকট এ সব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। যখন শিখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, একটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।"

আমি তাঁহাকে স্থানান্তর হইতে থার্ম্মোমিটার আকর্ষণ ও প্রত্যর্পণ করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। বহুমূল্য হীরক, নানাবর্ণের মণি ও মুক্তানিচয়, সুবর্ণ সন্দেশ, রসগোল্লা, কুইনাইন টেবলেট,

বায়োকেমিক 'নেট্রাম ফস', নারিকেল তৈল, গব্যঘৃত, কার্ব্বলিক এসিড, ফিনাইল, আঙ্গুর, বেদানা, কুঙ্কুম, কর্পূর, গ্রাফাইট প্রস্তর, ইউকিলাপ্‌টাস অয়েল, মহাশঙ্খ বটিকা, চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ, নানাজাতীয় পুষ্প ও ফল, অডিকোলন, ল্যাভেণ্ডার, মধু, গ্রিমল্ট সিরাপ ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থ নির্ম্মাণ আমি বহুবার দেখিয়াছি। তুলা, ফুল ও পত্রাদিকে প্রস্তরে পরিণত করিতে দেখিয়াছি। দৃষ্টিদ্বারা পলকের মধ্যে সমগ্র পুষ্পোদ্যানের গন্ধরাশি আকর্ষণ করিয়া বস্তুবিশেষের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। স্থূল বস্তুর উপাদানভূত পরমাণুসমূহ কি প্রকারে পৃথক্ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও স্থূল বস্তুর বিনাশ হয়, তাহা দেখিয়াছি। তাঁহাকে সূর্য্যরশ্মি হইতে সচেতন জীব পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি,—মাছি, শতপদী ও চামচিকা আমার চোখের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তবে মনুষ্য-সৃষ্টি এখনও সম্ভবপর হয় নাই। বাবাজী বিশ্বাস করেন যে, তেমনভাবে চেষ্টা করিলে হয়ত তাহাও চিরদিন অসম্ভব থাকিবে না। দীর্ঘকাল পরে আকর্ষণপূর্ব্বক বিশ্লিষ্ট পরমাণুসকলকে পরস্পর সংঘটিত করিয়া পূর্ব্ব বস্তুর পুনরুৎপত্তি করিতে দেখিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে তিনি বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে কোন জিনিষেরই বিনাশ হয় না। একখানা পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়া দেশান্তরে ও কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তকখানাই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি উহা শুধু দৃষ্টিভ্রম না হইয়া স্থায়িবস্তু বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, তাহা স্বীকার না করিয়া

পারা যায় না। যদি গঙ্গার এক ঘাটে এক ঘটি দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পরে অন্য ঘাটে জল হইতে বিশ্লেষণপূর্ব্বক ঠিক সেই দুগ্ধই বাহির করিয়া দেখান যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জিনিষেরই স্বরূপনিবৃত্তি কখনই হয় না। এইজন্যই জীব লোক-লোকান্তরে, এমন কি ব্রহ্মলোকে, গমন করিলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিৎ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন।

চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু, জ্বরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি ভাব—বিজ্ঞানের আলোকে সবই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে চন্দ্রবিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিজ্ঞান সহজেই বোধগম্য হয়। দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তের বিরুদ্ধ তড়িৎ-শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষে, এমন কি, নখ-জ্যোতিঃর প্রভাবে পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে। চাক্ষুষ-জ্যোতিঃর দ্বারা, বায়ুর কম্পন হইতে, নক্ষত্রের আলোকে—এমন কি, মানসিক স্পন্দন হইতেও সৃষ্টির প্রবাহ ধরিতে পারা যায়। সৌর-বিজ্ঞান শিখিলে এ সকল বিশেষভাবে পৃথক্ করিয়া শিখিবার প্রয়োজন হয় না।

৺কাশীধামস্থ আশ্রমে বিজ্ঞানশালা ব্যতিরেকে আর দুইটি মন্দির এস্থলে উল্লেখযোগ্য। একটি শিবমন্দির ও অপরটি গোপাল-মন্দির। শিবমন্দিরে বৃহৎ গৌরীপট্টের উপর অষ্টোত্তরশত বাণলিঙ্গ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। গোপাল-মন্দিরে শ্রীশ্রীগোপালজীর পদচিহ্ন স্থাপিত হইবে।

এই পদচিহ্নের একটু ইতিহাস আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

৺পুরীধামের আশ্রমে বাবাজীর রিক্ত আসনের উপর প্রাতঃকালে এই চিহ্ন পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবার অব্যবহিত পরে যখন ইহা দৃষ্টিগোচর হয় তখন ইহা হইতে বিদ্যুদ্দামের ন্যায় জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। বাবাজী তখন ক্রিয়া-গৃহে নিজের আসনে বসিয়া ভক্ত জয়দেবের রচিত 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' এই বচনের মনন করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইয়া নীচে আসিলেন—উপবেশনের স্থানে দৃষ্টি পড়িতেই ক্ষুদ্র দুইখানি উজ্জ্বল চরণরেখা নয়নপথে পতিত হইল। শ্রীভগবানের লীলা দেখিয়া ভাব ও ভক্তিতে আপ্লুত হইলেন। পেন্সিলের চিহ্ন দ্বারা ঐ পদরেখা চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ চরণ-চিহ্ন ৭, কুণ্ডু রোড—ভবানীপুরে কলিকাতার কর্পরেশন-ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবাজীর পরমভক্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। উহা শীঘ্র ৺কাশীধামে গোপালমন্দিরে স্থাপিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা সংক্ষেপে বাবাজীর চরিত-কথার উপসংহার করিলাম। বহু বক্তব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। সময় ও সুযোগ হইলে সময়ান্তরে বিস্তারিত রূপে সেই সব বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাবাজীর দীক্ষা-তত্ত্ব ও গুরু-করণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা-প্রণালীর বর্ণনা-কালে, বিবৃত হইবে। সাধনাদি সংক্রান্ত মতামতও ঐ উপলক্ষ্যেই বর্ণিত হইবে।

তাঁহার জীবন অতি-বিচিত্র, দেহ অদ্ভুত, সাধনাদি সকলই আশ্চর্য্য। নির্ম্মল চরিত্র, কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা অথচ অসাধারণ করুণা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি—এই সকল গুণ তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন,—"সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বিশ্বাস করিলেই ঠকিতে হইবে। এই জগতের প্রত্যেকটি পরমাণু তোমার প্রতিকূল। তোমার মিত্র একমাত্র তুমি নিজেই—নিজেকে ভুলিয়া বাহ্য মিত্রের দিকে আকৃষ্ট হইও না। নিজেকে জগতে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, এখন জগৎ হইতে নিজের বিক্ষিপ্ত উপাদান গুটাইয়া লও—লইবামাত্রই এক স্থানে নিজের পূর্ণ আদর্শ ঘনীভূতভাবে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, তাহারই অন্বেষণে কত জন্ম কত ভাবে ঘুরিয়াছ, এবার তাহাকে পাইয়া শান্তি লাভ কর। বিশ্বাস বড় দুর্লভ জিনিষ। যেখানে সেখানে বিশ্বাস স্থাপন

করিতে নাই। প্রতিপদে সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে—তবে ত বিশ্বাস স্থির হইবে। অস্থানে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়ার অপেক্ষা প্রথমে সংশয় করিয়া পরে অটল বিশ্বাসে স্থিতিলাভ করাই শ্রেষ্ঠ।" তিনি বলেন, "তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্ম খণ্ডন করা যায়। পুরুষকারের মহত্ত্ব অসীম। যোগাভ্যাসই মুখ্য পুরুষকার। সদ্‌-গুরূপদিষ্ট পথে তাঁহারই প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া নিরন্তর শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত যোগকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরে শুদ্ধ ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভক্তি পরিপক্ক হইলেই প্রেমের উদ্ভব হয়। তখন হৃদয় গলিয়া যায়। জগদম্বাকে পাইতে হইলে এই প্রেমই একমাত্র সাধন।"

বাবাজী বলেন যে, যোগ অতি গুহ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা বস্তুতঃ যোগ নহে। লোকালয়ে খুব অল্পসংখ্যক লোকেই যোগতত্ত্ব অবগত আছে। তিনি শাস্ত্র ও সদাচারের একান্ত পক্ষপাতী, লোকসংগ্রহের জন্য সামাজিক ব্যবস্থার অনুগামী, অথচ শুষ্ক আচারমাত্রে তৃপ্ত থাকার বিরোধী। তিনি বলেন, কর্ম্ম না করিয়া শুধু গ্রন্থাধ্যয়নে কোটি জন্মেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শাস্ত্র শুধু পথনির্দ্দেশক মাত্র—কর্ম্মদ্বারাই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

তাঁহার স্বভাব অভিমানহীন, সরল ও বালকোচিত। এত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও সাধন-সম্পৎ সত্ত্বেও তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য অবিনয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিচয়ের গাঢ়তার সহিত ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে—কিন্তু

তাঁহাকে যিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি তত অধিক মুগ্ধ হইয়াছেন;—যেন অনন্ত বস্তু, দেখিয়া দেখিবার সাধ মিটে না,—প্রতিক্ষণেই নব-নব ভাবের উদয় হয়।

তাঁহার শরীর তীব্র সাধনার ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাহ্য বায়ুর সহিত সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহার শ্বাস নাসাগ্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে না, বাহিরের বায়ুও তিনি ভিতরে টানেন না। সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ আভ্যন্তর বায়ুর দ্বারাই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দেহ শুদ্ধ বলিয়া ভিতরের বায়ু কখনও মলিন হয় না। এই জন্যই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে পদ্মগন্ধ বহিতে থাকে, সমগ্র দেহে পদ্মগন্ধ ছড়াইয়া যায়—তীব্র ক্রিয়ার সময়ে সমস্ত ঘর পদ্মগন্ধে ভরিয়া যায়। সুষুম্নাতে বায়ু চালনা করিতে পারিলে ক্রমশঃ দেহ, বায়ু ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া দেহে পদ্মগন্ধের বিকাশ হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব ও চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। * বাহ্য বায়ুর সঙ্গে মিশ্রণ হইলে এই গন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া গোলাপ, খসখস, চম্পক, যূথিকা প্রভৃতি বিচিত্র গন্ধে পরিণত হয়। যে জামা, কাপড়, প্রভৃতি বাবাজী দুই তিন ঘণ্টা ব্যবহার করেন তাহা সদ্‌গন্ধে এত অধিক আমোদিত হয় যে, ঘরে রাখিলে দুই তিন দিন সমগ্র ঘর সৌরভে ভরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে তাঁহার স্বেদবারি শিশিতে ভরিয়া দেখিয়াছি—উত্তম গন্ধ-জল তাহার নিকটে তুচ্ছ মনে হয়। নাভিতে হাত রাখিয়া

---

* হঠযোগিগণ ঘটাবস্থাতেই দেহে সদ্‌গন্ধের আবির্ভাব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, ইহা বিন্দু-শুদ্ধির লক্ষণ।

উপর হইতে জল ঢালিয়া দিলে জল পদ্মগন্ধে বাসিত হইয়া যায়। তাঁহার দেহে স্বভাবতঃই—অর্থাৎ স্ফুরণ ব্যতিরেকে—এত অধিক তড়িৎশক্তি ক্রিয়া করে যে, বোলতা, ভীমরুল, মশা প্রভৃতি দংশন করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া মরিয়া যায়। আমি ইহা স্ব-চক্ষে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার চাক্ষুষ তেজঃ যে কত তীব্র তাহা বলা যায় না। একবার একটি সাধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি জ্যোতির্ম্ময় কঠিন শিবলিঙ্গ লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। তিনি ঐ শিবলিঙ্গের দিকে সমনেত্রে তাকাইবামাত্র উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর একদিন একজনের তীব্র রোগ আকর্ষণ করিয়া একটি বাণলিঙ্গে অর্পণ করার ফলে বাণলিঙ্গটি ফাটিয়া গিয়াছিল।

তিনি একবেলা মাত্র অতি অল্প পরিমাণে আহার করেন—বিকালে প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন না। নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। প্রায় সমস্ত রাত্রিই এখনও আসনে বসিয়া থাকেন।

তাঁহার সিদ্ধি সংখ্যা অগণ্য। আমাকে একদিন তিনি মহিমাসিদ্ধির একটি প্রণালী বুঝাইতে গিয়া নিজের তর্জ্জনী অঙ্গুলীকে এত বৃহৎ ও স্ফীত করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। তাঁহার অণিমাদি সিদ্ধিও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। প্রাপ্তি, আকাশ-গতি, অন্তর্দ্ধান, কায়ব্যূহ প্রভৃতি সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে।

কিন্তু এ-সব সিদ্ধি তাঁহার নিকট একবারে তুচ্ছ ও নগণ্য। যে মহাধনে ধনী হইয়া আজ তিনি অতুল যোগৈশ্বর্য্যকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সেই ভগবৎ-প্রেমরূপ অমূল্য চিন্তামণি আজ যেন আমরা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে ভুলিয়া না যাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদে ও তাঁহার সঞ্চারিত বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ যেন আমরা তাঁহার অনুগমন করিতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানালোকে ও মৃত্যুরাজ্য হইতে অমরধামে লইয়া যাউন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদিগের বিনীত ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ